অধ্যায়ঃ মানব জীবনে বিভ্রান্তির সূচনাঃ

আল্লাহর একত্ববাদই হল আসল স্বভাবঃ

আল্লাহ্ সৃষ্টিকূলকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য এবং তাদের জন্য ঐ সব বিষয় তথা তার রিযিকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন যা তাদেরকে ইবাদত বন্দেগীর উপর সহযোগিতা করে। আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

আর আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য। আমি তাদের নিকট থেকে কোন প্রকার রিযিক চাইনা। আর আমি চাইনা যে, তারা আমাকে খাদ্য দান করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনিই রিযিক দাতা, শক্তির আধার ও শক্তিশালী। (আয্যারিয়াতঃ ৫৬-৫৮)

যদি কোন আত্মাকে স্বীয় মূল স্বভাবের উপর (যা নিয়ে সে জন্ম লাভ করেছে) ছেড়ে দেওয়া হয় তবে সে আল্লাহ্র ইবাদতের স্বীকৃতি দিবে, আল্লাহ্কে ভালবাসবে। তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না।

সুতরাং এ থেকেই বুঝা যায় তাওহীদ হচ্ছে মূল বিষয়- যা তার সৃষ্টিগত স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং শির্ক ইহার উপর নতুন ভাবে অনুপ্রবেশ করেছে মাত্র।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ

অতঃপর তুমি একনিষ্ঠভাবে সেই ধর্মের দিকে ধাবিত হও যেটা মেনে নেয়ার স্বাভাবের উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। (সূরা রুম ঃ ৩০)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

(كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)

প্রতিটি শিশু ফিত্বারাতের উপর জন্ম লাভ করে অতঃপর তাকে তার পিতা-মাতা ইহূদী (হলে ইহুদী) বানিয়ে দেয় অথবা খৃষ্টান (হলে খৃষ্টান) বানিয়ে দেয়। অগ্নি পূজক হলে অগ্নি পূজক বানিয়ে দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

মানবতার ইতিহাসে বিভ্রান্তির সূচনাঃ

সর্ব প্রথম শির্ক ও আকীদাহ্তে বিচ্যূতি ঘটে হযরত নূহ্ (আঃ) এ জাতির মধ্যে। এ কারনেই তিনি ছিলেন প্রথম রাসূল। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেনঃ

۞ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ

নিশ্চয় আমি আপনার নিকট ওহী করেছি যেমন ভাবে নূহ্ ও তার পরবর্তী নবীদের উপর ওহী করেছিলাম (নিসাঃ ১৬৩)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: আদম ও নূহ (আঃ) এর মধ্যে ১০টি শতাব্দী ছিল। এ শতাব্দীর সকলেই ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শির্ক প্রকাশ হওয়ার পিছনে প্রথম কারন ছিল পূণ্যবানদের ভক্তির ব্যাপারে অতিরঞ্জন করা। এবং সৃষ্টি কূলকে স্রষ্টার দরজায় উন্নীত করা।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ

وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾

আর তারা বললঃ তোমরা তোমাদের উপাস্য গুলিকে পরিত্যাগ করনা। আর পরিত্যাগ করনা ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউকদেরকে (সূরা নূহ - ২৩)

বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেনঃ এই গুলি হল নূহ (আঃ) এর জাতির পূণ্যবান ব্যক্তিদের নাম সমূহ। যখন তারা নিঃশেষ হয় তখন শয়তান তাদের জাতির নিকট এই মর্মে ওহীকরে যে, তোমরা তাদের মজলিসে তথা বসার স্থানে তাদের মূর্তি খাড়া কর এবং ঐ গুলোর নাম করন তাদের নামানুসারে কর। তখন তারা তাই করল। তবে ওগুলোর ইবাদত করা হল না। এমন কি যখন তারা নিঃশেষ হয়ে গেল ও ইলমকে ভুলা হল তখন তাদের ইবাদত শুরু হয়ে গেল।

এই জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা অতিরঞ্জন করতে নিষেধ করেছেন। এরশাদ হচ্ছেঃ

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ

হে কিতাবধারীগণ! তোমরা তোমাদের ধর্মে অতিরঞ্জন করনা।(নেসাঃ১৭১)
আর এর কারণ হল- হককে বাতিলের সাথে মিশিয়ে দেওয়া। আর উহা দুটি বস্তু দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

প্রথমতঃ সৎ ব্যক্তিদের মহব্বত করা। আর এই কারনেই তারা তাদেরকে ভাল বাসার জন্য ও তাদের ছবি দেখার জন্য আগ্রহে তাদের অবয়বের মূর্তী তৈরী করেছিল।

দ্বিতীয়তঃ বিদ্যানগণ ও ধার্মিকগণ উহা দ্বারা ভাল উদ্দেশ্য করেছিল অর্থাৎ ইবাদতে মনোযোগী হতে চেয়েছিল। কিন্তু এই উদ্দেশ্য তাদের পরবর্তীদের মধ্যে শির্কে পরিবর্তিত হয়। এখান থেকেই সাব্যস্ত করা যায় যে, যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে বিদআতের মাধ্যমে শক্তিশালী করতে চাই সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ উহার অপকার উপকার অপেক্ষা অধিক বেশী। উদাহরণ স্বরূপ ঐ ব্যক্তি যে রসূল (সাঃ)এর মহব্বতে অতিরঞ্জন করে আর এ জন্যই তার মিলাদ দিবস পালন করে তারা মূলতঃ তাদের এই বিদআত দ্বারা মঙ্গলই কামনা করে কিন্তু উহার মন্দের দিক গুলো উপকার অপেক্ষা বড় বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তিনি (সাঃ) বলেন, তোমরা আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করিও না যেমন অতিরঞ্জন করেছিল খৃষ্টানগণ ঈসা (আ:) প্রশংসার ক্ষেত্রে। বস্তুত আমি একজন বান্দাহ সুতরাং তোমরা বল 'আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল' (বুখারী ও মুসলিম)
তিনি আরো বলেন, তোমরা সাবধান থাক অতিরঞ্জন করা হতে কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এই অতিরঞ্জনই ধ্বংস করেছে। (মুত্তাফাকুন আলায়হে)
আরবগণ ইবরাহীম (আঃ) এর ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমর বিন লুহাই খোযাঈ এসে ইবরাহীমের দ্বীনের পরিবর্তন সাধন করে। এবং গোটা আরবে বিশেষ করে আরব উপদ্বীপে সেই সর্ব প্রথম মূর্তির আমদানী করে। সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতিরেকে ওগুলোর ইবাদত চালু হয়ে যায়। এবং এই পবিত্র দেশ গুলিসহ পার্শবর্তী দেশ গুলোতে শীর্ক ছড়িয়ে পড়ে। ইহা অব্যাহত থাকে তাদের মধ্যে। অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে পাঠান সর্বশেষ নবী হিসেবে। তিনি (সাঃ) তখন মানুষদেরকে তাওহীদ ও ইব্রাহীম (আঃ)এর ধর্মের অনুসরনের প্রতি দাওয়াত দিলেন। আল্লাহর পথে যথাযথ ভাবে জিহাদ

করলেন যার ফলশ্রুতিতে তাওহীদের বিশ্বাস ও ইব্রাহীম (আঃ) এর ধর্ম পূনরায় ফিরে এল। মূর্তী গুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করা হল। এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দ্বারা দ্বীনকে পূর্ণ করলেন। জগতবাসীদের উপর স্বীয় নেয়ামতের পূর্ণতা দান করলেন।

ঐ পথেই ফযীলত পূর্ণ শতাব্দী তথা এই জাতির প্রথম যুগের ব্যক্তিগণ পরিচালিত হলেন। অতঃপর পরবর্তী শতাব্দী গুলিতে মুর্খতার প্রসার হল। এবং অন্যান্য ধর্মের আচরণাদীর অনুপ্রবেশ ঘটল। সুতরাং পূনরায় শির্ক আগমন করে ফেলল এই উম্মতের অধিকাংশের মধ্যে। পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত আলেমদের কারনে এবং কবর সমূহকে পাকা করার কারনে। আর উহা মূলতঃ ঘটেছিল ওলী এবং পূণ্যাবনদের অতিরিক্ত সম্মান দেখাতে গিয়ে। এবং তাদেরকে ভাল বাসার দাবী করতে যেয়ে। এমন কি তাদের কবরের উপর প্রাসাদ তৈরী করা হয়েছে এবং ওগলোকেই আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে। নৈকট্য অর্জনের বিভিন্নস প্রকার যেমন দুওয়া, মদদ প্রার্থনা যবেহ করা এবং তাদের সম্মানের জন্য নযর নেয়ায করা। তারা এই শির্ককে সালেহীনের মাধ্যমে ওসীলাহ্ গ্রহন নামে অবিহিত করেছে এবং উহাকে তাদের মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ সাব্যস্ত করেছে। তাদের ধারনানুযায়ী উহা ইবাদত নয়। অথচ তারা ভুলে গেছে ইহাই ছিল প্রথম যুগের মুশরিকদের কথা। কারণ তরাও বলত,

مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ

আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি যাতে করে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। (যুমার ঃ ৩)
আর এই শির্ক সত্বেও যা মানুষের মাঝে পূর্বে ছিল এবং বর্তমানেও বিদ্যমান- রয়েছে তাদের অধিকাংশই তাওহীদে রুবুবীয়তের উপর ঈমান আনত। শুধু মাত্র তারা ইবাদতে শির্ক করত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

তাদের অধিকাংশই আল্লাহর উপর ঈমান আনে শির্ক বিজড়িত অবস্থায়। (ইউসূফ ঃ১০৬)

প্রশ্নমালাঃ

১। আল্লাহ কেন মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন? দলীলসহ উল্লেখ কর।
২। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় কর:
ক) ভাল-মন্দ কাজ করা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব।
খ) আদম ও নূহ (আঃ) এর মাঝে দশটি যুগ ছিল। ঐ যুগের প্রত্যেকেই ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।
গ) কুসাই বিন কিলাব এসে ইব্রাহীম (আঃ) এর দ্বীনকে পরিবর্তন করেছিল যার উপর আরবগণ প্রতিষ্ঠিত ছিল।
ঘ) প্রথমে যে মূর্তী পূজা করে এবং উহা আরব উপদ্বীপে আমদানী করে সে হল খুযাআ বংশোদ্ভূত।
৩) আল্লাহ্র বাণী- তারা অধিকাংশই আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে শির্কে বিজড়িত অবস্থায়। অত্র বাণীতে ঈমান দ্বারা কি উদ্দেশ্য?
৪) জনৈক লোক কোন মৃত ব্যক্তি, কবর ও সৎ ব্যক্তিদের নিকটে মদদ তলব করে। তার ধারনা যে, এরূপ করা তাদের ইবাদত নয়, বরং ইহা তাদের দ্বারা ওসীলা তলব করা ও তাদের মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ করা মাত্র। এ দাবী কতটুকু সত্য? কিভাবে দলীল প্রমাণ দ্বারা তুমি তার প্রতিবাদ করবে?

অধ্যায়ঃ তাওহীদের সংরক্ষন এবং শিরকের যাবতীয় পথ বন্ধ করনে মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)এর প্রানান্তকর প্রচেষ্টাঃ

নিশ্চয় নবী (সাঃ) শির্কের দিকে পৌঁছায় এমন যাবতীয় পথকে বন্ধ করেছেন এবং উহা হতে চরম ভাবে সতর্ক করেছেন। উহার নমূনা নিম্নে কিছু প্রদত্ত হলঃ

১. অতিরঞ্জন করা হতে নিষেধাজ্ঞা ঃ

আর উহা হল- প্রশংসা বা কুৎসা বা ইবাদত ইত্যাদি ক্ষেত্রে সীমালংঘন করা।
আহলে কিতাবদের মাঝে ইহাই ঘটেছিল। আল্লাহ বলেনঃ

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ

হে কিতাবধারী (ইহূদী, খৃষ্টানগণ) তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘন করিও না।(নেসাঃ ১৭১)
নাসারাগণ ঈসা (আঃ) এর প্রশংসায় সীমালংঘন করে বলেছে- তিনি হলেন আল্লাহর পুত্র এবং তাকে তিন জন উপাস্যের তৃতীয় জন সাব্যস্ত করেছে। পক্ষান্তরে তার কুৎসা রটনার ব্যাপারে ইহূদীগন সীমালংঘন করতঃ বলেছে, তার মা হল ব্যাভিচারিনী, আর সে হল জারয সন্তান।(নাউযু বিল্লাহ্) এ থেকে বুঝা যায় যে, উভয় দলই তাঁর ব্যাপারে সীমালংঘন করেছে।

সীমালংঘন বেশ কিছু বিপর্যয় টেনে আনে যেমনঃ

১। যার ব্যাপারে সীমালংঘন করা হয়েছে তাকে তার স্বস্থানের উর্ধে উঠানো হয় যদি তা প্রশংসার মাধ্যমে হয়। আর তাকে তার মর্যাদার হানী করা হয় যদি তা কুৎসা রটানোর মাধম্যে হয়।
২। প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করা প্রশংসিত ব্যাক্তির ইবাদতের পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়।
৩। উহা আল্লাহ্র মহত্ব প্রকাশের পথে বিরাট বাধা। কারণ মানুষ ঐ সময় বাতিল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।
৪। যার ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে সে উপস্থিত থাকলে আত্মগর্ব বোধ করবে এবং নিজেকে বড় ভাববে যদি সে অতিরঞ্জন প্রশংসার মাধম্যে হয়। আর উহা শত্রুতা ও বিদ্বেষ অবধারিত করবে যদি তা কুৎসা রটানোর মাধ্যমে হয়।

সীমালংঘনের প্রকার ভেদঃ

ক) আকীদার ক্ষেত্রে সীমালংঘন ঃ

আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তর্ক বাগিশদের কথা। তাদের কুটতর্ক আল্লাহর জন্য নমূনা পেশ করা, আল্লাহ্র গুণাবলীকে পরিত্যাগ করা পর্যন্ত তাদেরকে গড়িয়েছে। কিন্তু মধ্যম পন্থিগণ ঐ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বন করেছে। সুতরাং তারা ঐ গুলি সাব্যস্ত করনে, নাকোচ করনে ও পবিত্র করণে সীমালংঘন করেনি।

খ) ইবাদতের ক্ষেত্রে সীমালংঘনঃ

তথা বেশী বাড়াবাড়ি করা যেমন- ইবাদতের সামান্যতম ত্রুটিকে কুফরী ও ইসলাম হতে বহির্ভূত হয়ে যাওয়া মনে করা। যেমন- খারেজী ও মুতাযেলাগণ করেছিল। এদের বিপরিত হলো মুরজিয়া ফের্কা। তারা বলেঃ কবীরাগুণাহ্ করলেও ঈমানে কোন প্রকার ঘাটতি হয় না, মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট। এর ভিত্তিতে তাদের নিকটে ইবলীসও ঈমানদার কারণ সেও আল্লাহকে স্বীকার করে। বস্তুতঃ ইহাই হল পদচ্যুতি ও বিভ্রান্তি।

কিন্তু এ ক্ষেতে মধ্যম পন্থা হল সুন্নী জামাআতের পন্থা। তা হল এই যে, ঈমান আনুগত্যের মাধম্যে বৃদ্ধি পায় আর অবাধ্যতার মাধ্যমে হ্রাস পায়। কবীরাহ গুনাহ সম্পাদনকারী ঈমানের সীমারেখা হতে বেরিয়ে যায় না। তবে ঈমান হ্রাস পায় স্বীয় অবাধ্যতা অনুসারে। অবশ্য কুরআন-হাদীসের দলীল যেটাকে কুফরী বলেছে সেটা ভিন্ন কথা।

ইবাদতের ক্ষেত্রে সীমাতিরিক্ত করার নমূনা সমূহের অন্যতম হল যেমন ইবাদতে যেয়ে নিজেকে বাধ্যতা মূলক অধিক কষ্টের মধ্যে পতিত করা। ইহা সীমালংঘন, কারণ নবী (সাঃ) উহা থেকে নিষেধ করেছেন।

অনুরূপভাবে শরয়ী সীমার অতিরিক্ত করা। যেমন- বড় বড় পাথর দিয়ে জামারাত গুলিকে মারা। অথবা সালাত ইত্যাদি আদায়ের পর শরঈ যিকিরের অতিরিক্ত কিছু করা। ইবাদতে সীমাতিরিক্ত করার উপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- রসূল (সাঃ) জামরায়ে আকাবার দিন সকালে বলেন, (তখন তিনি স্বীয় উটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন) আমার জন্য কঙ্কর কুড়াও তখন আমি তাঁর জন্য ছোলার দানার মত সাতটি কঙ্কর কুড়ালাম। উহা তিনি স্বীয় হাতে রেখে নাড়া-চাড়া করতে করতে বললেন, এরকম পাথরই তোমরা নিক্ষেপ কর। আর তোমরা সাবধান থেক দ্বীনের ব্যাপারে সীমাতিরিক্ত থেকে। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে দ্বীনের ব্যাপারে এই সীমাতিক্রমই ধবংস করেছে। (নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমদ)

অত্র হাদীস দ্বারা অতিরঞ্জন করা হারাম প্রতিপন্ন হল দুটি দিক থেকে।

এক- নবী (সাঃ)এর সতর্কী করণ। আর এতে নিষেধাজ্ঞা তো রয়েছে এবং অতিরিক্ত বস্তুও রয়েছে।

দুই- উহা পরবর্তীদের ধবংসের কারণ। যেমন করে আমাদের পূর্ববর্তীগণ ধবংস হয়েছে। আর যা ধবংসের কারণ তা অবশ্যই হারাম হবে।

মানুষ ইবাদতের ক্ষেত্রে নিম্নরূপঃ

তাদের মধ্যকার দুটি শ্রেণী দু দিকে এবং তৃতীয় শ্রেণী মধ্যম পন্থি। তাদের মধ্যে কেউ বাড়াবাড়ী কারী আবার তাদের মধ্যে কেউ হল ত্রুটিকারী। গ্রহণযোগ্য পন্থা হলো মধ্যম পন্থা। দ্বীনের ব্যাপারে কঠুরতা ও অতিরঞ্জন করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে বৈধ নয় উহাতে শিথীলতা করা ও তার প্রতি গুরুত্ব হীনতা প্রদর্শন করা। বরং আবশ্যক হলো মধ্যম পন্থা ।

নবী (সাঃ) পূণ্যবান ও ওলীদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এই বাড়াবাড়ি স্বয়ং তাদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করার শামিল। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন- একদা কিছু লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! হে আমাদের উত্তম ব্যক্তি, হে আমাদের উত্তম ব্যক্তির সন্তান, হে আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার সন্তান। তখন নবী (সাঃ) বললেন-হে জনগণ! তোমরা তোমাদের কথা বল। তবে লক্ষ্য রাখবে শয়তান যেন তোমাদেরকে বিপথগামী করতে না পারে । আমি মুহাম্মদ, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি চাইনা যে, তোমরা আমাকে আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার উধ্যে উন্নীত করবে। (নাসায়ী)

গ) লেনদেন বা বৈষয়িক ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িঃ

লেনদেন বা বৈষয়িক ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি সাধারণতঃ হয়ে থাকে প্রতিটি বস্তুকে হারাম করণের মাধ্যমে যদিও উহা সেই বস্তু উপার্যনের মাধ্যম বা উসীলা হয়। অনুরূপ ভাবে এ রূপ ধারণা করা যে, চলার পথে মানুষের জীবনের জরুরী বস্তু ছাড়া বর্ধিত ভাবে অন্য কিছু গ্রহণ করা জায়েয নয়। মূলতঃ ইহাই হল সূফীদের তরীকা।

ঠিক এদের বিপরিত ঐ সকল লোকদের শিথিলতার অবস্থান, যারা সম্পদ বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে সূদৃঢ় করার জন্য সকল বস্তুকে বৈধ মনে করে। এমন কি সূদ ও প্রতারণাও তাদের কাছে অবৈধ নয়। এদের এই শিথিলতার কারণে তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যূত। আর মধ্যম পন্থা হল- একথা বলা যে, শরয়ী বিধানানুযায়ী কিছু লেনদেন বৈধ আবার শরয়ী বিধানানুযায়ী কিছু লেনদেন অবৈধ।

২. নবী (সাঃ) কবরের উপর ভিত্তি স্থাপন তথা কবর পাকা করতে সতর্ক করেছেন। যেমন- আবুল হায়্যাজ আল্ আসাদী (রাঃ) বলেন: আমাকে হযরত আলী বিন আবু তালেব (রাজিঃ) বলেন, (হে আবু হায়্যাজ! আমি কি তোমাকে ঐ কাজ দিয়ে প্রেরণ করব না যা দিয়ে আমাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রেরণ করেছিলেন।) আর তা ছিল ইহা যে, তুমি কোন মূর্তী পেলে তা ভেঙ্গে চুরমার করে দিবে, কোন উচু কবর (পেলে) তা মাটি বরাবর না করে ছাড়বে না। অপর রেওয়ায়েতে আছে- কোন ছবি পেলে তা না মিটিয়ে ছাড়বে না। (মুসলিম)

তিনি কবর চুনকাম ও পাকা করতে নিষেধ করেছেন। হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) কবর চুনকাম করতে, তার উপর বসতে, উহা পাকা করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

অনুরূপ কবরে বাতি জ্বালানোও নিষিদ্ধ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কবর যিয়ারত কারিনী মহিলাদেরকে ও উহার উপর মসজিদ নির্মান এবং বাতি স্থাপনকারীকে অভিশম্পাত করেছেন। (সুনান গ্রন্থ সমূহ, হাদীসটি যয়ীফ) তা ছাড়া কবরে বাতি জ্বালানো বিধর্মীদের আচরণ তাই উহা অবশ্যই বর্জনীয়।

৩. নবী (সাঃ) কবরের পাশে ছালাত আদায় করা থেকে সতর্ক করেছেন। হযরত জুনদব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি। 'সাবধান! নিশ্চয় তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবীদের কবর গুলোকে মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা আমার কবরকে মসজিদ হিসাবে গ্রহন করবেনা। আমি এ থেকে তোমাদের কে নিষেধ করছি। (মুসলিম) কবরকে মসজিদ স্বরূপ গ্রহন করার অর্থ হল উহার পাশে ছালাত আদায় করা, যদিও উহার উপর মসজিদ নির্মাণ না করা হয়।

বস্তুতঃ কবর স্থান সমূহের যিয়ারত শরীয়ত সিদ্ধ কাজ। কবর বাসীগণ দুআর মুখাপেক্ষী। তারা যাতে উপকৃত হতে এমন ভাবে তাদের যিয়ারত করা উচিত, তাদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য যিয়ারত করা বৈধ নয়। সুতরাং যে যিয়ারতের দ্বারা মৃত ব্যাক্তিদের থেকে উপকার অর্জন উদ্দেশ্য হয় উহা বিদআতী যিয়ারত । পক্ষান্তরে যে যিয়ারত দ্বারা মৃতদের উপকার সাধন ও তাদের অবস্থা থেকে উপদেশ গ্রহন করা উদ্দেশ্য হয়, সে যিয়ারত হলো শরীয়ত সম্মত যিয়ারত।

ইবনে সাদী (রঃ) বলেন, কবরে যা করা হয় তা দুই প্রকারঃ

প্রথম: শরীয়ত সম্মত, আর উহা হল শরয়ী তরীকা মুতাবেক যিয়ারত। যার উদ্দেশ্যে সফর করা হয় না এবং যার মাধ্যমে সুন্নতের অনুসরন, আখেরাতের ও উপদেশ গ্রহন উদ্দেশ্য হয়।

দ্বিতীয়ঃ নিষিদ্ধ যিয়ারত আর উহার দুই প্রকারঃ

ক। যা হারাম এবং শির্কের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। যেমন- কবর স্পর্শ্ করা এবং কবরবাসীদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম (উসীলা) সাব্যস্ত করা। সেখানে সালাত আদায় করা, উহা আলোকিত করা, কবর পাকা করা এবং উহা ও উহার অধিবাসীদের সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করা। (যদিও উহা ইবাদতের মর্যাদায় না পৌঁছে)

খ। বড়শির্কঃ যেমন- কবরবাসীদেরকে দোয়া করা। তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া, বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের নিকট চাহিদা পূরণের আশা করা। ইহা ঠিক তেমনই যা মূর্তীপূজারীরা তাদের মূর্তীর সাথে করত।

৪. নবী (সাঃ) তাঁর কবরকে বার বার যিয়ারত করতে ও কবরের পাশে অভ্যাসগত ভাবে দোয়া এবং নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জমায়েত হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। বরং এর পরিবর্তে যে কোন স্থান হতে তার উপর বেশী বেশী দরূদ ও সালাম পড়তে বলেছেন। কারণ উহা তাঁর নিকটে পৌঁছে থাকে। আর যদি নবী (সাঃ)এর কবর এভাবে বারবার যিয়ারত করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়, তবে বাকী কবর গুলোকে উৎসবে পরিণত করার নিষিদ্ধতা আরো ভাল ভাবে প্রমাণিত হয়।

আলী বিন হুসাইন হতে বর্ণিত, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে নবী (সাঃ) এর কবর বরাবর ফাঁকা স্থানে এসে প্রবেশ করে দোয়া করছে। তখন তিনি তাকে নিষেধ করলেন আর বললেন- আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবো না যা আমি শুনেছি আমার পিতা (হুসাইন রাজিঃ)হতে তিনি আমার দাদা (আলী রাজিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি রাসূল (সাঃ) এর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাঃ) বলেন: আমার কবরকে উৎসব হিসাবে এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত কর না। আমার উপর দরূদ ও সালাম পাঠ কর। কারণ, তোমাদের সালাম তোমরা যেখানেই থাক না কেন আমার নিকট পৌঁছে থাকে। (হাদীস সহীহ)

৫. রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কাফেরদের সদৃশতা অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। তাদের উৎসবে, তাদের আকৃতিতে, তাদের পোশাক পরিচ্ছদে এবং তাদের সাথে বিশেষিত এমন প্রত্যেকটি বিষয়ে । আর উহা এজন্যই করেছেন যাতে করে কাফেরদের সাথে বাহ্যিকভাবে সদৃশ্যতা অবলম্বন করা হতে মুসলমানদেরকে দূরে রাখা যায়। কারণ ইহা মূলতঃ গোপনভাবে তথা শির্কে তাদের সদৃশ্যতা অবলম্বন করার একটি মাধ্যম।

অনুরূপ ভাবে তিনি (সাঃ) নফল নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন এমন নিষিদ্ধ সময় গুলিতে যে সময় মুশরিকরা গাইরুল্লাহকে সেজদা করে। আর তা এজন্য যাতে করে নিষিদ্ধ সদৃশ্যতা অবলম্বিত না হয়। অনুরুপ ভাবে এমন স্থানে পশু যবেহ করতে নিষেধ করেছেন যেখানে জাহিলী যুগের কোন উপাস্য ছিল। যদিও তা বর্তমান না থাকে। এবং তাদের সাথে সদৃশ্যতা অবলম্বন করা উদ্দেশ্য না হয়।

হযরত সাবেত বিন যহহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি বুওয়ানা নামক স্থানে উট যবেহ্ করার মান্নত করল। তখন নবী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'উহাতে কি জাহেলী যুগের কোন প্রকার মূর্তী কিংবা পূজার বস্তু ছিল যার ইবাদত করা হত? তারা বললেন, না । তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, ওখানে কি তাদের কোন ঈদ-উৎসব পালিত হত? তারা বললেন, না। তখন রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, তুমি তাহলে তোমার মান্নত পূর্ণ কর। (আর তোমাকে ঐ সব জিজ্ঞেস করলাম এ জন্য যে) আল্লাহ্র অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কোন প্রকার নযর পূর্ণ করা চলে না। ঠিক ঐ বিষয়েও চলে না আদম সন্তান যার মালিক নয়। (আবু দাউদ)

৬. নবী (সাঃ) মূর্তী বা স্মরণার্থে নির্মানকৃত কৃত বিশেষ পদ্ধতির চিহ্ন ও পাথর এবং ছবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন।

নবী করীম (সাঃ) প্রাণীর ছবি তোলার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। বিশেষ ভাবে সম্মানিত ব্যক্তিদের যেমন আলেম, আবেদ, পরিচালক, নেতা প্রমূখ ব্যক্তিদের ছবি তোলতে নিষেধ করেছেন। সকল মূর্তী একই পর্যায়ের, হয় তা কাঠের উপর, কাগজের উপর, দেওয়ালের, কাপড়ের উপর ছবি অঙ্কনের মাধ্যমে হোক অথবা খোদাই করে মূর্তীর আকৃতিতে তৈরী করা হোক। কারণ এ ছবিই হল শির্কে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। এটা এজন্য যে, ছবি উঠানো এবং ছবি নির্মাণ করার মাধ্যমেই এ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শির্ক সংঘঠিত হয় । হযরত নূহ্ (আঃ) এর কওমে কিছু সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তারা মৃত্যুবরণ করলে মানুষ শোকাভিভূত হয়। ফলে শয়তান তাদের নিকট এই মর্মে পরামর্শ দেয় যে, তাদের বসার স্থানসমূহে মূর্তী খাড়া কর এবং তাদের নামানুসারে সেগুলোর নাম রাখ। তারা তাই করল। তবে তখনও মূর্তী পূজা শুরু হয়নি। যখন তারা মৃত্যু বরণ করল এবং ইলম চর্চা উঠে গেল তখন ঐ মূর্তী গুলোর ইবাদত শুরু হতে লাগল। হে পাঠক! লক্ষ্য করুন, স্মরণের নিমিত্তে তৈরীকৃত এই সব মূর্তী গুলির কারনে পরিস্থিতি শির্কের দিকে গড়িয়ে গেল এবং উহাই নূহ্ (আঃ) এর সাথে বিরোধিতার কারণ হল যা তাদেরকে ঝড়-তুফান ও প্লাবনের আযাবের মাধ্যমে পতন হওয়ার ও আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির ক্রোধের স্বীকার হওয়ার কারণে পরিণত হল।

ইহাই আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেয় যে, ছবি তোলা এবং স্মৃতী স্বরূপ মূর্তী নির্মাণ করা কি মারাত্নক অপরাধ। এ কারণেই নবী (সাঃ) ছবি গ্রহন কারীদেরকে অভিশম্পাত করেছেন।

হযরত আবু জুহায়ফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) অভিশম্পাত করেছেন ওয়াশিমা[১] এবং মুস্তাওশিমা[২] কে, অভিশম্পাত করেছেন সূদ গ্রহীতা ও সূদ দাতাকে, আরো তিনি নিষেধ করেছেন কুকুরের মূল্য ও ব্যাভিচারিনীর উপার্জিত সম্পদ গ্রহন করা হতে। তিনি অভিশম্পাত করেছেন ফটো গ্রহনকারীদেরকে। (বুখারী)

রাসুল (সাঃ) আরো বলেছেন, কিয়ামাতের দিবসে সবচেয়ে কঠিন শাস্তির স্বীকার হবে ছবি গ্রহনকারীগণ। (অর্থাৎ যারা ফটো তোলে) (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি (সা:) ছবিগুলোকে মিটিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেস্তা প্রবেশ করে না। কাসেম বিন মুহাম্মাদ (রা:) হতে বর্নিত, আয়েশা (রা:) তাকে বর্ননা করে শুনিয়েছেন যে, তিনি একটি চাদর ক্রয় করে ছিলেন যাতে ছবি ছিল। রাসুলুল্লাহ্ (সা:) যখন তা দেখলেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ঘরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় অপছন্দের ছাপ লক্ষ্য করলাম। তাই বললাম হে রসূল! আমি আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের (সা:) দিকে প্রত্যাবর্তন করছি - আমি কি অপরাধ করেছি? তখন রসূলুল্লাহ্ (সা:) বললেন: এই চাদরের অবস্থা কি? (কেন এই চাদরটি?) আমি বললাম: আমি উহা ক্রয় করেছি যাতে করে আপনি তার উপরে বসতে পারেন ও চাদর বালিশ হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। তিনি (সা:) বললেন: নিশ্চয় এই ছবি গুলোর মালিক (প্রস্তুত কারী) কিয়ামত দিবসে শাস্তির স্বীকার হবে। তাদেরকে বলা হবে: যা সৃষ্টি করেছ তাতে জীবন দান কর। তিনি (সা:) আরো বলেন: নিশ্চয় ছবি থাকা ঘরে রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

৭. নবী (সা:) এমন শব্দ সমূহ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন যা শির্কের ধারনা দেয় অথবা যার মধ্যে দাসত্বকে গাইরুল্লাহ্র দিকে সম্পর্কিত (ব্যপকভাবে) করে, অথবা যাতে আল্লাহর শানে বে-আদবী করা হয়। আর উহার নিখুত শব্দের প্রতি তিনি দিকনির্দেশনা করেছেন। নবী (সা:) বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন একথা না বলে: তুমি তোমার "রব"কে খানা দান কর, তোমার "রব"কে ওযূ করাও। বরং সে যেন বলে: আমার "সায়্যেদ" নেতা, আমার মাওলা (মনিব) অনুরূপ ভাবে তোমাদের কেউ যেন না বলে আমার আব্দ (দাস) আমার "আমাহ্" (দাসী) বরং সে যেন বলে: আমার "যুবক" আমার "যুবতী", আমার গোলাম (নওজোয়ান) - (বুখারী)

৮. বরকতের আশায় বৃক্ষরাজী ও পাথর দিয়ে তাবারূক গ্রহন করা। কারন শয়তান ধীরে ধীরে তাদেরকে গাইরুল্লাহ্ ও পাথরের ইবাদতের দিকে অগ্রসর করে, এবং প্রয়োজনাদী পূরনের জন্য ওগুলোর কাছে সরাসরী প্রার্থনা করার মানষিকতা গড়ে তুলে।

যেমন আবূ ওয়াকেদ লাইসী-র হাদীছ থেকে বুঝা যায় তিনি বলেন: আমরা রসূলুল্লাহ্র (সা:) সাথে হুনাইনের যুদ্ধে বের হলাম। তখন আমরা ছিলাম কুফর যুগের নিকটবর্তী নুতন মুসলমান। তদানিন্তন কালে মুশরিকদের একটি কূলবৃক্ষ ছিল যার পাশে তারা উপবেশন করত এবং তাতে নিজেদের সমরাস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। উহাকে "যা-তু আন্ওয়াত" বা ঝুলন্ত বস্তুরাজী সমৃদ্ধ বৃক্ষ বলা হত। একদা আমরা এমনই একটি কুল বৃক্ষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। আমরা বললাম হে আল্লাহ্র রসূল, তাদের যেমন "যা-তু আনওয়াত" আছে, আমাদের জন্যও তেমনি একটি "যা-তু আনওয়াত" নির্দিষ্ট করে দিন। তখন রসূলুল্লাহ্ বললেন: আল্লাহু আকবার! এগুলি পূর্ববর্তীদের রীতি নীতির কথা তোমরা বললে। যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি "তোমরা ঐরূপ কথাই বললে, যে রূপ বনী ইসরাঈলগণ হযরত মূসা (আ:)কে বলেছিল "আপনি আমাদের ইবাদতের জন্য মাবূদ ঠিক করে দিন যেমন তাদের পূজা অর্চনার জন্য মাবূদ সুনির্দিষ্ট রয়েছে, হযরত মূসা (আ:) বললেন তোমরা অজ্ঞ জাতি (৭:১৩৮) তার পর রসূলুল্লাহ্ (সা:) বললেন: "দেখ তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের

[1] যে মহিলা শরীরের কোন অংশ সূচ ইত্যাদি দিয়ে খোদাই করে। অতঃপর তাতে রং দেয় কিংবা সেখানে কোন কিছু লিখে দেয়।

[2] যে মহিলা উল্লেখিত কর্ম অনুসন্ধান করে।

রীতি নীতি অনুসরন করে চলবে" {হাদীছটি ইমাম তিরমিযী বর্ননা করত: উহাকে ছহীহ বলেছেন, অত্র হাদীছটিকে ইমাম আহম্মদ ও বর্ননা করেছেন}

মুশরিকগন তাদের অস্ত্র-শস্ত্র ঐ বৃক্ষে ঝুলিয়ে রাখতো বরকত হাসিলের জন্য। সাহাবীগনও নবীর (সা:) নিকট তলব করলেন যেন তাদের সমরাস্ত্র গুলো ঝুলানোর জন্য একটি বৃক্ষ নির্ধারন করেন। তাদের এ দাবীর উদ্দেশ্য ছিল উক্ত বৃক্ষ দ্বারা বরকত লাভ করা। উহার ইবাদত করা নয়। আর উহা দ্বারা তাবার্‌রক গ্রহন করা যদি উহার ইবাদত করার উদ্দেশ্যে হয় তবে ইহা বড় শির্কের অন্তর্ভূক্ত হবে।

- **শরীয়ত সম্মত তাবার্‌রক কয়েক প্রকার যেমনঃ**

ক) কথা, কাজ ও অবস্থা দ্বারা বরকত অর্জন করা। কোন মুসলিম যদি কল্যান এবং বরকতের আশায় এ গুলো সম্পাদন করে এবং সে ক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুস্মরন করে তাহলে তার উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

কথা দ্বারা বরকত লাভের আশা করা যেমন: আল্লাহ্‌র যিকর, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদী। আল্লাহ্ বলেন: (كتاب أنزلناه إليك مبـــارك) আমি {হে মুহাম্মাদ!} তোমার নিকটে একটি বরকতময় কিতাব অবতীর্ন করেছি। (সূরা ষোওয়াদ: ২৯) কুরআনের বরকত হলো, ইহার একটি হরফের নেকী দশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়, অনুরূপ ভাবে উহা মানুষের জন্য রোগ মুক্তি, হেদায়েত এবং রহমতের উপকরন এবং উহা তেলাওয়াত কারীর জন্য সুপারিশকারী ইত্যাদি।

কর্ম দ্বারা বরকত লাভের আশা করা যেমনঃ

১) ইলম তলব করা ও তা অধ্যয়ন করা। উহার বরকত হল: দুনিয়া ও আখেরাতে উন্নতি লাভ।

২) জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা: উহার বরকত হল: নেকী বেশী হওয়া, গুনাহের কাফ্‌ফারাহ্ হওয়া ইত্যাদী বিভিন্ন কাজ।

খ) যে সকল স্থানের মধ্যে আল্লাহ বরকত রেখেছেন তা থেকে বরকত হাসিলের আশা করা। (এ ধরনের বরকত হাসিল করা বৈধ) যদি কোন ব্যক্তি তার ঐ আমলে নিয়তকে খালেস করে এবং এককভাবে রসূলের অনুসরন করে। এ সমস্ত বরকতপূর্ন স্থানের মধ্যে অন্যতম হলঃ

মসজিদ সমূহঃ মসজিদ থেকে বরকত অর্জন সম্ভব হবে সেখানে জামাআতে নামায পড়ার মাধ্যমে, ই'তেকাফের মাধ্যমে, ইলমী মজলিসে উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমে ইত্যাদি।

তবে এই মসজিদ গুলোর দেওয়াল স্পর্শ করে কিংবা উহার মাটি ইত্যাদী স্পর্শ করে তাবাররূক আশা করা বৈধ হবে না কারন তা নিষিদ্ধ।

অনুরূপ ভাবে ফযীলতপূর্ণ বরকতময় স্থান সমূহের অন্যতম হলঃ মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, মসজিদুল আকসা, মক্কা, মদীনা, শাম, হজ্বের পবিত্র স্থান সমূহ– যেমন আরাফাহ্, মুযদালেফাহ্, মিনা ইত্যাদী।

গ) সময় দ্বারা তাবার্‌রক অর্জন করা যেগুলোকে শরীয়ত বিশেষ ফযীলত, বরকত ও গুনাহ মাফ ইত্যাদী বিশেষন দ্বারা বিশেষিত করেছেন। ঐ সময় গুলির অন্যতম হল: কদরের রাত্রি (লায়লাতুল কদর) রমাযানের শেষ দিন গুলো, দশই যিলহজ্ব, জুম্‌আর দিন, প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ। এসকল ক্ষেত্রে বরকতের অনুসন্ধান হতে হবে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নির্দেশিত পন্থার অনুসরন করে।

ঘ) আরো বরকতময় কতিপয় অবস্থার অন্যতম হল ঃ একত্রিত হয়ে খানা খাওয়া, পাত্রের সাইড হতে খাদ্য গ্রহন করা এবং খাবার শেষে অঙ্গুল গুলো জিহবা দ্বারা চেটে খাওয়া ইত্যাদী। আর উহা দ্বারা বরকত অন্বেসন নবী (সাঃ)এর দিক নির্দেশনার অনুসরনের মাধ্যমেই সম্ভব।

ঙ) ঐ সমস্ত খাদ্য দ্বারা বরকত অর্জন করা যেগুলোর বরকত নবী (সা:) হতে কিংবা কিতাবুল্লাহ্ হতে প্রমানিত। সেগুলোর অন্যতম হল: যয়তুনের তৈল, দুধ, কাল জিরা, যমযমের পানি ইত্যাদী।

চ) পশু পাখি দ্বারা তাবার্‌রক গ্রহন করা, শরীয়তের দৃষ্টিতে যার মধ্যে বরকত প্রমানিত। যেমন: ঘোড়া পালন ইত্যাদী।

ছ) ঐ সমস্ত বৃক্ষ রাজী দ্বারা তাবার্‌রক গ্রহন করা যে গুলোর বরকতের কথা শরীয়তে এসেছে। যেমন: খেজুর গাছ ইত্যাদী।

এগুলোর মধ্যে বরকত আল্লাহ্‌ ও তার রসূল (সা:) থেকে সুপ্রমানিত। তবে এ ক্ষেত্রে শরিয়তের সীমালংঘন করা যাবে না।

নিষিদ্ধ তাবার্‌রকঃ উহার অন্যতম হলঃ

ক) বরকতপূর্ন স্থান দ্বারা শরীয়ত সম্মত নিয়মের পরিপন্থি পদ্ধতিতে বরকত হাসিলের চেষ্টা করা। যেমন– মসজিদ সমূহের দরজা গুলোকে চুম্বন করা, উহার মাটি দ্বারা রোগ মুক্তির আশা করা, কা'বা শরীফের দেওয়াল অথবা মাকামে ইবরাহীম ইত্যাদীকে স্পর্শ করা।

দু:খের বিষয় কতিপয় মানুষ বিশেষ কোন ইবাদতকে শুধুমাত্র বরকত হাসিলের মাধ্যম হিসেবে মনে করেছে। যেমনঃ কিছু লোক রূকনে ইয়ামানীকে মাসেহ্‌ করত: উহা দ্বারা নিজের চেহারা, বক্ষদেশ, সঙ্গের ছোট শিশুটিকে মাসেহ করে। আর ইহার অর্থই হল– তারা রূকনে ইয়ামানীকে তাবাররূকের বিষয় গন্য করেছে, ইবাদতের বিষয় গণ্য করেনি। আথচ ইহা একটি মূর্খতা। হযরত উমর (রা:) বলেন: (হে পাথর!) নিশ্চয় আমি জানি তুমি একটি পাথর মাত্র, তুমি কোন ক্ষতিও করতে পারনা, উপকারও করতে পারনা, যদি আমি রসূলুল্লাহ (সা:)কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম তবে তোমাকে চুম্বন করতাম না। (বুখারী ও মুসলিম)

খ) কবরস্থানে যাওয়া যিয়ারতের উদ্দেশ্যে নয় বরং কবরস্থান বরকতময় স্থান এবং সেখানে দোয়া করা উত্তম এই বিশ্বাসে সেখানে দোয়া করা।

গ) নামায ও দোয়ার উদ্দেশ্যে হেরা গুহায় যাওয়া। অথবা ছওর গুহায় যাওয়া নামায ও দোয়া করার উদ্দেশ্যে। অথবা তূর পর্বত ইত্যাদী স্থানে যাওয়া (অনুরূপ কোন উদ্দেশ্য)। একথা সর্বজন বিদিত যে, যদি এ সমস্ত জায়গায় যিয়ারত করা মুস্তাহাব হত এবং ওতে সওয়াব হত তবে অবশ্যই নবী করীম (সা:) তা আমাদেরকে জানাতেন। কিন্তু মূলতঃ উহা নবাবিস্কৃত বিদ্‌আত।

ঘ) অনুরূপ ভাবে ঐ সমস্ত জায়গা যেখানে রসূল (সা:) হঠাৎ কোন এক সময় নামায পড়েছেন। যেমন সফরাবস্থায় কোন স্থানে নামায আদায় করেছেন কিন্তু সে স্থানকে তিনি (সা:) নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে করেননি। এধরনের স্থান অনুসন্ধান করে উহাতে নামায আদায় করত: আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করা বিধি সম্মত নয়। কারন উহার মধ্যে রসূলের (সা:) সালাত আদায় করা উদ্দেশ্যগত ছিল না বরং তা হঠাৎ হয়েছিল।

ঙ) অনুরূপ ভাবে বরকতময় সময় যেমন: রমাযান মাস, কদরের রাত্রি, জুমার দিন ইত্যাদী এগুলোর বরকত তলব করতে হবে ঐ সময় গুলোতে শরীয়ত সম্মত ইবাদত সম্পাদনের মাধ্যমে। বিদ্‌আতী ইবাদতের মাধ্যমে নয়।

চ) পূর্বোক্ত নিষিদ্ধ তাবার্‌রকের আরো অন্যতম হলঃ নির্দিষ্ট কোন সময়কে তাযীম, আনুষ্ঠানিকতা ও বিশেষ ইবাদতের জন্য খাস করা। যেমন- জন্ম দিবস পালন, ইসরা ও মেরাজের দিবস, হিজরত দিবস, বদর দিবস, মক্কা বিজয় দিবস ইত্যাদী বিভিন্ন নববিস্কৃত বিষয়।

ছ) বাতিল তাবার্‌রকের আরো অন্যতম হলঃ সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব ও তাদের রেখে যাওয়া নিদর্শন দ্বারা বরকত অর্জন করা। (উল্লেখ্য যে,) সাহাবীদের কারো থেকে একথা প্রমানিত নয় যে, তাঁদের কেহ আবু বাকর (রা:) এর ওযূ, ঘাম, কাপড়-চোপড় ইত্যাদী দ্বারা বরকত অর্জন করেছে, বা উমার, উসমান, আলী (রাজিঃ) প্রমূখ থেকে কোন প্রকার তাবাররূক গ্রহণ করা হয়েছে। বরং সাহাবায়ে কেরাম (রা:) নবীর (সা:)এর ওযূর পানি, তাঁর শরীর, ঘাম, থুথু, চুল এবং জামা কাপড় ইত্যাদীর দ্বারা বরকত নিয়েছেন। আর অত্র তাবার্‌রক নবীর সাথেই খাস তার উপর অন্য

কোন সৎ ব্যক্তিকে কিয়াস করা যাবে না। কারন "তাবার্‌রূক"ও একটি বিশেষ ইবাদত যার ভিত্তি হল অবগতি ও নবীর অনুসরনের উপর। নবাবিস্কার তথা বিদ-আত এর উপর নয়।

প্রশ্নমালা

প্রশ্ন-১) নিশ্চিত ভাবে নবী (সা:) শির্কের দ্বারে পৌঁছায় এমন সমস্ত পথই বন্ধ করে দিয়েছেন এবং উহা থেকে (বিশ্ববাসীকে) সতর্ক করেছেন ইহার তিনটি নমূনা উল্লেখ কর?

প্রশ্ন-২) নিম্ন বর্নিত বিষয় গুলোর বিধান দলীল সহ উল্লেখ করঃ
ওলী এবং পূণ্যবানদের ক্ষেত্রে প্রশংসায় কিংবা কুৎসায় সিমাতিক্রম করা, কবরের উপর চেরাগ বাতি জালানো, এমন স্থানে যবেহ্ করা যার মধ্যে জাহেলী যুগের কোন উপাস্য ছিল কিংবা উহা তাদের উৎসব পালনের স্থানে। প্রানীর ফটোতোলা, তোমার 'রবকে' খাদ্য দাও একথা বলা?

প্রশ্ন-৩) পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শির্ক কখন প্রকাশ পায় ? আর উহার কারন কি?

প্রশ্ন-৪) তাবাররূক দুই প্রকারের। কোন প্রকার তাবাররূক শির্কের দিকে গড়িয়ে যাওয়ার কারন হয়?

প্রশ্ন-৫) শরীয়ত সম্মত তাবাররূকের তিনটি প্রকার এবং নিষিদ্ধ তাবাররূকের তিনটি প্রকার উল্লেখ কর?

অধ্যায়ঃ তাওহীদের ফযীলত এবং উহা দ্বারা যে সমস্ত পাপের কাফ্ফারা হয় তার বর্ণনাঃ

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

যারা ঈমান এনেছে এবং তারা তাদের ঈমানকে শির্কের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা আর তারাই হল সুপথ প্রাপ্ত। (আন আম : ৮২)

হযরত উবাদাহ বিন সামেত (রা:) হতে বর্নিত, রসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেন: যে ব্যক্তি এই বলে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই তিনি এক তার কোন শরীক নেই। এবং (আরো সাক্ষ্য দেয় যে) মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহ্র বান্দা ও রসূল এবং ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও রসূল এবং তাঁর কালেমা যা তিনি মারয়ামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়েছিলেন, এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ। এবং (আরো সাক্ষ্য দেয় যে) জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য। তাহলে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন সে যেকোন আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক না কেন। (বুখারী ও মুসলীম)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্নিত, নবী (সা:) বলেন: মুসা (আ:) বললেন: হে আমার প্রতি পালক আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরন করবো এবং ডাকবো। আল্লাহ্ বললেন: হে মুসা আপনি বল: لا إله إلا الله (আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই) তিনি বললেন: হে আমার প্রভু! আপনার প্রত্যেক বান্দাইতো এ কথা বলে থাকে? আল্লাহ্ বললেন হে মুসা! যদি সাত আসমান ও আমি ব্যতীত উহার আবাদকারী (অধিবাসী) এবং সাত আসমান এক পাল্লায় (দেওয়া) হয় আর لا إله إلا الله "আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই" কে অপর এক পাল্লায় দেওয়া হয় তবে لا إله إلا الله কলেমার পাল্লাই ভারী হয়ে যাবে। (ইবনু হিব্বান, হাকেম এবং তিনি উহাকে ছহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন)

অত্র আয়াত এবং হাদীছ দুটি প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় শির্ক করা একটি অন্যায় কাজ এবং ঈমান বাতিল কারী- যদি তা বৃহৎ শির্ক হয়। আর উহা ঈমান হ্রাস কারী-যদি তা ছোট শির্ক হয়। আরো প্রমাণ হয় যে, একত্ববাদ ঘোষণা কারীদের মধ্যে পাপীগণ চিরস্থায়ী ভাবে জাহান্নামে থাকবে না। এবং কোন আমলই উপকারে আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা আল্লার জন্য খালেস এবং নবী মুহাম্মাদ (সা:) এর সুন্নাত মোতাবেক না হবে।

অধ্যায়ঃ তাওহীদের তাফসীর এবং لا إله إلا الله (আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই) একথা সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ

যাদেরকে তারা আহবান করে তারা নিজেরাইতো তাদের পালন কর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্য শীল তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।" (সূরা বনী ইসরাঈল-৫৭)

এই আয়াতটি পরিস্কার বর্ণনা দেয় যে, আম্বিয়া, সালেহীন আল্লাহ্র সাথে কাউকে আহবান করে না। কারন তারা হল (আল্লাহর) বান্দা এবং আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষী।

মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾

এবং স্মরন করুন ঐদিনের কথা যে দিন ইব্রাহীম স্বীয় পিতা এবং জাতিকে বলেছিলেন নিশ্চয় তোমরা যার ইবাদত কর আমি তা থেকে চিরমুক্ত। আমি শুধু মাত্র ইবাদত করি ঐ সত্তার যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং নিশ্চয় তিনিই আমাকে অচিরেই সুপথ দেখাবেন। (যুখরুফ ২৬-২৭)

অত্র আয়াতে একথার বর্ণনা রয়েছে যে, لا إله إلا الله "আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই" এর অর্থ হল শির্ক থেকে চিরমুক্ত থাকা, এবং আল্লাহকে ইবাদতের ক্ষেত্রে একক হিসাবে মান্য করা।

নবী (সা:) বলেন: যে ব্যক্তি لا إله إلا الله বলবে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় উপাস্যকে অস্বীকার করবে তার সম্পদ, রক্ত হারাম বলে গন্য হবে। আর তার হিসাব আল্লাহর উপর বর্তাবে। (মুত্তাফাক্বুন আলায়হে বা বুখারী ও মুসলিম)

অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং তার সম্পদ সিজ করে নেওয়া হারাম হবে দুইটি বস্তুর মাধ্যমে:

১) لا إله إلا الله বলা।

২) আল্লাহ্ ব্যতীত বাকী সমস্ত উপাস্যকে অস্বীকার করা। যদি আন্তরিক ভাবে সত্যবাদী হয় তবে আল্লাহ্ তাকে বিনিময়ে جنات النعيم তথা নেয়ামত রাজীর জান্নাত দান করবেন। আর যদি সে মুনাফেক হয় তবে আল্লাহ তাকে আখেরাতে (পরকালে) যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দিবেন। তবে দুনিয়াতে আমরা তাকে তার বাহ্যিক দিকের ভিত্তিতে মুসলিম হিসাবে গন্য করব।

প্রশ্নমালা

প্রশ্ন-১)তাওহীদের ফযীলত সংক্রান্ত দুটি দলীল উল্লেখ কর?
প্রশ্ন-২)অশুদ্ধ ও শুদ্ধ বাক্য কোনটি নির্ণয় কর এবং অশুদ্ধ বাক্যটি শুদ্ধ কর ঃ

ক) শির্ক একটি যুল্‌ম (অন্যায়) এবং উহা ছোট হোক কিংবা বড় হোক ঈমান বরবাদ কারী। ( )
খ) তাওহীদ পন্থীদের মধ্যে সাধারন পাপীগণ জাহান্নামে চিরকাল থাকবে না। ( )
গ) আমল কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হল উহা শুধুমাত্র একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর জন্য হওয়া। ( )

অধ্যায়ঃ শির্কের বর্ণনা ও ব্যাখ্যাঃ

শির্কের সংজ্ঞা : শির্ক হল আল্লাহর রবুবিয়াত (কর্মে), উলুহীয়াত (ইবাদাত), এবং তার নাম ও গুণ সমূহে কোন শরীক সাব্যস্ত করা, আর বেশীর ভাগ শির্ক ইবাদতের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে যেমন -কেউ আল্লাহর সাথে অন্যকে আহবান করল, অথবা তার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার ইবাদত করল যেমন: নযর মান্নত করা, ভয় করা, আশা করা, ভালবাসা ইত্যাদী।

শির্ক কেন সব থেকে সর্ববৃহৎ গুনাহ্?

উহা কয়েকটি কারণে ঃ

১- কারণ উহা মাখলুককে উলুহিয়্যাতের বৈশিষ্ট সমূহে খালেকের সাথে সদৃশ্য (তুলনা) করা। সূতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শির্ক করল সে যেন তাকে আল্লাহর সাথে সদৃশ্য সাব্যস্ত করল অথচ ইহা সব থেকে বড় অন্যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ١٣

নিশ্চয় শির্ক একটি মহা অন্যায়। (লোকমান: ১৩)

২- আল্লাহ এই মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি শির্ক হতে তওবা করবে না তিনি তাকে ক্ষমাও করবেন না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তার সাথে অংশী স্থাপন করাকে মার্জনা করেন না। অবশ্য তদাপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের গুনাহ যাকে ইচছা মার্জনা করে দেন।" (নেসা : ৪৮)

৩- আল্লাহ আরো সংবাদ দিয়েছেন এই মর্মে যে, তিনি মুশরিকদের জন্য জান্নাতকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং সে জাহান্নামের আগুনে সদা সর্বদা থাকবে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিবেন, তার স্থান হবে জাহান্নাম, আর (এ সমস্ত) যালিমদের জন্য কোন সাহায্য কারী থাকবে না। (মায়েদাহ্ -৭২)

৪) নিশ্চয় শির্ক সমস্ত আমলকে বাতিল ও বরবাদ করে দেয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٨٨

"যদি তারা শরীক করে (আল্লাহর সাথে) তবে তাদের কৃত আমল গুলি বরবাদ (বাতিল) হয়ে যাবে।" (আল আন্আম -৮৮)

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾

নিশ্চয় আপনার প্রতি এবং আপনার প র্ববর্তী নবীদের প্রতি এই মর্মে ওহী করা হয়েছে যে, আপনি যদি শির্ক করেন তবে অবশ্যই আপনার আমল বাতিল হয়ে যাবে। এবং অবশ্যই আপনি ক্ষতিগ্রস্থদের দলভুক্ত হবেন। (যুমার -৬৫)

৫) নিশ্চয় মুশরিক ব্যক্তির রক্ত এবং ধন সম্পদ বৈধ। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

মুশরিকদিগকে হত্যা কর যেখানেই তাদেরকে পাবে এবং তাদেরকে পাকড়াও কর এবং ঘেরাও কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি স্থানে (পাহারা দিয়ে) বসে থাক। (তাওবাহ্ -৫)

আবু হোরায়রা (রা:) হতে বর্নিত, তিনি বলেন: নবী (সা:) এরশাদ করেছেন "আমি লোকেদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এ কথা না বলবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই। আর যে ব্যক্তি "আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই" একথা বলবে সে আমার থেকে নিজ আত্মাকে, এবং সম্পদকে বাঁচিয়ে নিবে তবে ইসলামের অধিকারের কথা ভিন্ন, আর তার হিসাব আল্লাহর উপর বর্তাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৬ - শির্ক হল ত্রুটি এবং দোষনীয় বিষয়। এর উভয়টি হতে আল্লাহ্ নিজেকে পবিত্র রেখেছেন। সূতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করবে সে আল্লাহর জন্য ঐ বিশেষণ সাব্যস্ত করবে যা থেকে তিনি নিজেকে পবিত্র রেখেছেন। আর ইহাই তো হল আল্লাহর সাথে চরম পর্যায়ের বিরোধীতা এবং চরম পর্যায়ের ধৃষ্টতা।

৭ -নিশ্চয় শির্ক হল সব চেয়ে বড় (কবীরাহ্) গুনাহ্। হযরত আবু বাকর (রা:) হতে বর্নিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেন: আমি কি তোমাদেরকে সব থেকে বড় (কবীরা) গুনাহগুলো সম্পর্কে সংবাদ দিবনা? আমরা বলরাম: অবশ্যই হে আল্লাহ্র রসূল! তিনি বললেন: উহা হল আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

শির্কের প্রকার সমূহ:

প্রথম প্রকার : (الشرك الأكبر) **শির্কে আকবার বা সবচেয়ে বড় শির্কঃ**

উহার সংজ্ঞা: উহা হল ইবাদতের প্রকার হতে কোন একটি বিষয় গায়রুল্লাহর জন্য ব্যয় করা। অথবা উহা হল: কোন ব্যক্তির আল্লাহর জন্য তার রূবুবিয়্যাতে, কিংবা উলুহিয়্যাতে, কিংবা তার নাম ও গুনাবলীতে শরীক সাব্যস্ত করা।

উহার বিধান : এই শির্ক ব্যক্তিকে ধর্ম হতে বের করে দেয় এবং এ ধরনের শির্ককারী যদি তওবা ছাড়া মৃত্যু বরন করে তবে তাকে চিরস্থায়ী ভাবে জাহান্নামে রাখা হবে ।

বড় শিকের কতিপয় উদাহরন :

ক) গায়রুল্লাহ্‌র জন্য যবেহ করা। উহা দুই প্রকার:

১) সম্মান এবং নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য গায়রুল্লাহর জন্য যবেহ করা। আর ইহাই হল বড় শির্ক। যেমন কবর এবং শয়তান ইত্যাদির জন্য যবেহ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ ﴿١٦٢﴾

"হে রসূল আপনি বলুন: নিশ্চয় আমার ছালাত, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মরন সবই সমগ্র জগতের পালন কর্তা আল্লাহর জন্য উৎসর্গীত। তার কোন শরীক নেই। আর আমাকে এরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর আমিই মুসলিমদের প্রথম ব্যক্তি। (আন্‌আম-১৬২-১৬৩)

আরো আল্লাহতালার বাণী: (فصل لربك وانحر) তুমি তোমার প্রতি পালকের জন্য নামায পড় এবং কুরবানী কর। (কাওসার: ২)

তারেক বিন শিহাব যুহরী হতে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: একটি মাছিকে কেন্দ্রকরে জনৈক ব্যক্তি জান্নাতে গিয়েছে আবার অপরজন জাহান্নামে গিয়াছে ঐ একটি মাছিকেই কেন্দ্র করে। তারা (সাহাবীগন) জিজ্ঞাসা করলেন : এটা কি ভাবে হল হে আল্লাহর রসূল ?! তিনি বললেন: দুজন ব্যক্তি কোন কওমের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল যাদের একটি মূর্তী ছিল। সেই মূর্তী উপলক্ষে কোন কিছু কুরবানী করার আগে কেউ সেখান দিয়ে অতিক্রম করতে পারতো না। তারা এই দুই ব্যক্তির একজনকে বলল: তুমি (এই মূর্তীর নামে) কুরবানী কর সে বলল: কুরবানী দেয়ার মত আমার নিকট কোন কিছুই নেই । তারা বলল: একটি মাছি হলেও তা কুরবানী দাও । তখন সে একটি কাছি ধরে তা (মূর্তীর উদ্দেশ্যে) উৎসর্গ করল। এবার তারা তার রাস্তা ছেড়ে দিল। এই ব্যক্তিটি (তার এ কর্মের কারণে) জাহান্নামে গেল। তারা অপর জনকে বলল: তুমিও এই মূর্তীও জন্য কিছু উৎসর্গ (কুরবানী) কর। সে বলল: আমি আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো জন্য কোন কিছ কুরবানী করতে প্রস্তুত নই। তারা তাঁকে হত্যা করল, ফলে এই ব্যক্তিটি জান্নাতে প্রবেশ করল। (আহমদ)

২) আল্লাহর নামে তবে অন্যের উপলক্ষ্যে খুশী ও সম্মানের নিমিত্ত পশু যবেহ করা। যেমন: মেহমানের জন্য যবেহ করা। ইহা বৈধ, বরং কখনও এরূপ করাই কাম্য। তবে এক্ষেত্রে যবেহের মূহুর্তে আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করা (ওয়াজিব) আবশ্যক।

খ) গায়রুল্লাহকে ভয় করা: আর উহা কয়েক ভাগে বিভক্ত:

১- ইবাদত, বিনয়, তাযীম মিশ্রিত ভয়। অর্থাৎ যাকে গোপন ভয় বলে। এরূপ ভয় আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারো জন্য প্রজোয্য নয়। সূতরাং যে ব্যক্তি উহা গায়রুল্লাহর জন্য নিবেদন করবে সে বড় ধরনের শির্কে লিপ্ত হবে। যেমন: কেউ মূর্তী গুলোকে এবং মৃতদেরকে ভয় করল। অথবা তথা কথিত ওলীদেরকে ভয় করল। কখনও তারা সেগুলোকেই আল্লাহ অপেক্ষা বেশী ভয় করে। (এসব কার্য কলাপ বড় শির্কের অন্তর্ভূক্ত)।

২- অবধারিত বস্তু তথা জিহাদ ও ন্যায়ের আদেশ-অন্যায়ের নিষেধ করা, শরয়ী ওযর ছাড়া মানুষের ভয়ে পরিত্যাগ করা। এ ধরনের ভয় হল হারাম। তবে উহা ছোট শির্কের পর্যায়ভূক্ত।

এধরনের ভয়ই ছিল আল্লাহ তাআলার এই বানী অবতীর্ন হওয়ার কারন:

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ

যাদেরকে কিছু মানুষ বলল: নিশ্চয় জনতা তোমাদের (বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার) জন্য জামায়েত হয়েছে সূতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর।" (আলে ইমরান: ১৭৩)

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন :

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

"নিশ্চই সে হল শয়তান যে তার বন্ধুদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে সূতরাং তাদেরকে ভয় করিও না বরং আমাকেই ভয় কর যদি তোমরা মুমিন হও।" (আল ইমরান: ১৭৫)

শয়তান মুমিনদেরকে পাপাচারী এবং কাফেরদের থেকে ভয় দেখায় যাতে করে তারা তাদেরকে ন্যায়ের আদেশ না দেয় এবং অন্যায়ের নিষেধ না করে এবং তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ না করে। আর এ ভয় ঐ ব্যক্তিরই হয় যার ঈমান দূর্বল। কিন্তু শক্তিশালী ঈমানের অধীকারী আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। আর আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার কারনে মানুষকে ভয় করাও গায়রুল্লাহ্কে ভয় করার শামিল। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যে বলে: আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর। আর যদি তাকে আল্লাহ্র পথে কষ্ট দেয়া হয় তবে মানুষের কষ্টকে আল্লাহ্র শাস্তির মত মনে করে" (আন্কাবুত: ১০)

আল্লাহ্কে ভয়-ভীতি করে চলা ওয়াজিব তার সন্তুষ্টিকে সৃষ্টিকুলের সন্তুষ্টির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া ওয়াজিব। যেমন: নবী (সা:) বলেন:

"যে ব্যক্তি মানুষকে না খোশ রেখে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অন্বেষন করবে, আল্লাহ্ তার উপর রাযী হবেন এবং মানুষকেও তার উপর রাযী করবেন, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে না খোশ রেখে মানুষের সন্তুষ্টি তলব করবে, আল্লাহ্ তার উপর নারায হবেন এবং মানুষকেও তার উপর নাখোশ করবেন।" (ইবনু হিব্বান)

৩ - স্বভাবগত এবং সৃষ্টিগত ভীতিঃ যেমন দুশমনের ভয়, হিংস্র জীব জন্তুর ভয়, আগুনের ভয়, এধরনের ভয় মূলত: বৈধ। দলীল আল্লাহ্ তাআলার বানী:

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ

"অত:পর তিনি (মুসা আ:) সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে।" (কাসাস : ২১)

কিন্তু যদি ঐ ভয় কোন ওয়াজেব পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে কিংবা হারাম কাজ করতে বাধ্য করে তবে উহা হারাম হবে। উদাহরন স্বরূপ: যদি কেউ এমন বস্তুকে ভয় করে যা তার উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না এবং তার এই ভীতি তাকে বাধ্য করে জামাতে নামায পড়া পরিত্যাগ করতে তবে এধরনের ভয় ভীতি হারাম বলে গন্য হবে। অনুরূপ ভাবে যদি কোন ব্যক্তি তাকে ভয় দেখিয়ে কোন হারাম কাজ করার প্রতি বাধ্য করে এবং সেও তাকে ভয় করে অথচ সে যার ভয় দেখিয়েছে তা বাস্তবায়ন করা তার পক্ষে অসম্ভব তবে এধরনের ভয়ও হারাম হবে। কারন উহা উল্লেখ যোগ্য কারন ছাড়াই হারাম কাজ করতে বাধ্য করে।

গ) গাইরূল্লাহ্র নিকট এমন বিষয় আশা করা যার সে ক্ষমতা রাখেনা যেমনঃ প্রয়োজন পূরণ এবং বিপদ মুক্তি প্রার্থনা করা শির্কে আকবারের অন্তর্ভূক্ত ঃ

যেমন ইদানিং কালে কবরের উপর নির্মিত দেওয়াল গুলির পাশে করা হচেছ। এরূপ করা বড় শির্ক একথার দলীল আল্লাহ্ তাআলার বানীঃ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ

"আর তারা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত করছে যা তাদের কোন উপকার অপকার কিছুই করতে পারে না এবং তারা বলেঃ ইহারা আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ কারী।" (সূরা ইউনুসঃ ১৮)

তবে সৃষ্টির নিকট এমন বস্তু আশা করা বৈধ যে ব্যাপারে সে ক্ষমতাবান। হযরত আবু হোরায়রা (রা:) হতে বর্নিত তিনি বলেনঃ যখন রসূলের (সা:) উপর এই আয়াতটি নাযিল হল (وأنذر عشيرتك الأقربين)। "এবং আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন।" (সূরা শুআরা-২১৪) তখন তিনি আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে কুরাইশ সম্প্রদায়! (অথবা এধরনের কোন বাক্য বললেন:) তোমরা তোমাদের নিজেকে ক্রয় কর কারন আমি আল্লাহ্র নিকট তোমাদের কোনই উপকার করতে পারবো না। হে আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্য কোনই উপকারে আসব না। হে সাফিয়্যাহ্ (রাঃ) রাসূলের (সা:) ফুফু আমি তোমাদের কোনই উপকার করতে পারবো না আল্লাহ্ থেকে। হে নবী তনয়া ফাতেমা! আমার সম্পদ হতে যা ইচছা তলব কর। আমি তোমার কোনই উপকার করতে পারবো না আল্লাহ্র শাস্তি হতে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইহা হল নবীর (সা:) বানী- তাঁর সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয় তথা নিজ গোত্র, চাচা, ফুফু, মেয়ের প্রতি। তিনি তাদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে কোন কিছুই করতে পারবেন না। তাহলে তিনি অন্যদের উপকার করবেন কিভাবে যারা তাদের চেয়ে দুরে অবস্থান করছে? এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি, যারা রাসূলের সাথে নিজেকে সংযুক্ত রাখে, তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তার ব্যক্তিত্ব দ্বারা ওসীলা গ্রহন করে ইত্যাদি - যা বর্তমানে হচে্ছ এবং ইতিপূর্বে ছিল - তাদেরকে শয়তান ধোকায় ফেলেছে এবং হকের পথ হতে দুরে সরিয়ে দিয়েছে। কেননা এরা এমন কতিপয় ব্যক্তিদের অন্ধানুসরন করেছে যারা নিজেদেরকে নিজেরাই আলেম মনে করে এবং তাদের চর্তুপার্শের লোকেরাও তাদেরকে আলেম ভেবে তাদের অন্ধানুসরন করে এবং তারাও তাদের মত একথা গুলি আওড়ায়ঃ

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به   سواك عند حلول الحادث العمم

"হে সৃষ্টির সেরা সম্মানিত! আমার জন্য কে আছে আপনি ব্যতীত যার কাছে আমি কঠিন বালা মসীবতে আশ্রয় প্রার্থনা করবো?" (নাউযুবিল্লাহে মিন যা-লেক)

ইত্যাদি বহু ধরনের শির্ক। তারা এমন বস্তুর সাথে সংযুক্ত হয়েছে যা সংযুক্ত হওয়ার কোন বস্তুই নয়। কারন রসূল (সা:) সম্পর্কিত যে বিষয় উপকারে আসবে তা হলঃ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর অনুসরন করা। কিন্তু তাঁকে আহ্বান করা তাঁর নিকটে প্রার্থনা করা, আশা আকাংখা পূরনের জন্য তাঁর সাথে সম্পৃক্ত থাকা, এবং ভীতিকর বিষয়ে তাঁকে ভয় করা (ইহ্যাদি) এগুলো সবই বৃহৎ শির্কের অন্তর্ভূক্ত। ইহা মূলতঃ নবী (সা:) থেকে ব্যক্তিকে আরো সূরে করে দেয় এবং আল্লাহ্র শাস্তি হতে মুক্তি লাভের সম্ভাবনাও দূরে সরে যায়। আর কেউ যদি তাদের প্রতিবাদ করে তবে তারা জওয়াব দেয় এই ভাবে যে, তুমি নবীর হক এবং আল্লাহ্র দরবারে তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে জানো না। তুমি জানো না যে তিনি হলেন সারা বিশ্বের নেতা, তাঁর জন্যই জ্বিন ও মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করা

হয়েছে, তিনি আরশের (বা আল্লাহ্‌র) নূর থেকে সৃষ্টি লাভ করেছেন। ইত্যাদি কথা বলে যখন তারা সাধারন মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে তখন জাহেলেরা তাদেরকে সত্যই মনে করে। আর মুমেন মুলত: তার আবেগেই নবীর (সা:) ভালোবাসার দিকে ঝুকে পড়ে। কিন্তু মানুষের উপর ওয়াজিব হল: নিজ আবেগকে ফায়সালাকারী হিসাবে গ্রহন না করা, বরং তার উপর ওয়াজেব হল কিতার ও সুন্নাত যা প্রমান করে এবং বিশুদ্ধ ও সন্দেহ মুক্ত বিবেক যাকে সমর্থন করে তার অনুসরন করা।

হযরত আনাস (রা:) হতে বর্নিত তিনি বলেন: নবী (সা:) ওহুদের দিন মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হন এবং তার সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায়। এ আঘাত পেয়ে তিনি (সা:) বললেন: কি করে ঐজাতি সফলকাম হবে যারা তাদের নবীর মাথা ফাটিয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে নাযিল হলঃ (**ليس لك من الأمر شـــيء**) "এ বিষয়ে আপনার কোনই কর্তৃত্ব নেই।" (বুখারী, মুসলিম) ইনি হলেন নবী (সা:) যার মাথা ফাটানো হয়েছিল এবং সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল ওহুদ যুদ্ধে। যদি কোন প্রকার কর্তৃত্বের অধিকার রাখতেন তবে নিজ হতে ক্ষতিকর বস্তু অপসরন করতেন কিন্তু আসলে তিনি তার মালিক নন। বরং ইহা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং কিভাবে জাহেলগন তার নিকটে নিজ ক্ষতি অপসারন বা তাদের জন্য উপকার সাধনে তলব করে? আর যদি রসূল উহার অধিকার না রাখেন তবে ওদের অবস্থা কিরূপ যারা মূর্তী, আওলিয়া, কবর, ফেরেস্তাদেরকে ঐ বিষয়ে ডাকে? নবী (সা:) যখন বললেন: "কিভাবে ঐ জাতি সফল কাম হবে যারা স্বীয় নবীর মাথা ফাটিয়েছে" - আল্লাহ্‌ তার জবাবে এরশাদ করলেন: এ ব্যাপারে তাঁর কোনই কর্তৃত্ব নেই। কর্তৃত্ব মাত্রই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি একক, যিনি সৃষ্টি কারী, রিযিকদাতা এবং সমগ্র পৃথীবি নিয়ন্ত্রনকারী। তিনিই অনুপস্থিত উপস্থিত (গায়েব-হাযের) সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনিই সমস্ত বিষয়ের শেষ পরিনতি সম্পর্কে অবগত। যদি রাসূল (সা:) এর কোন বিষয়ে কোন প্রকার কর্তৃত্ব না থাকে বরং একমাত্র তা আল্লাহ্‌রই জন্য নির্দিষ্ট হয়, তবে অন্যদের কর্তৃত্ব না থাকা আরো ভালো ভাবেই অনুমেয়।

ঘ) গাইরুল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা: আর উহা দুই ভাগে বিভক্ত:

১- এমন বিষয়ে সৃষ্টির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা যার সে সামর্থ রাখে না। ইহাই হল শির্ক কেননা তোমাকে ঐ অনিষ্ট হতে রক্ষা করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌ রাখেন (দ্বিতীয় কেউ নয়) কবরবাসী কিংবা জ্বিন জাতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা এধরণের (বড়) শির্কের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন:

وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾

"আর অনেক মানুষ অনেক জ্বিনের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত ফলে তারা জিনদের আৱম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। (সূরা জ্বিন: ৬)

আরবগন অন্ধকারাচছন্ন যুগে যখন কোন উপত্যাকায় অবতরন করত তখন উঁচু কণ্ঠে ডাক দিয়ে বলত: এই স্থানের বড় মাতাব্বরের নিকট তার নির্বোধ জাতি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, জ্বিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হারাম। কারন এই প্রার্থনা আশ্রয় তলব কারীর কোন উপকার করে না বরং আরো তার ভয় ভীতিই বৃদ্ধি করে।

হযরত খাওলা বিনতে হাকীম (রা:) হতে বর্নিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সা:)কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবতরন পূর্বক বলবে (এই দোয়াটি)

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ .

"আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ বাণী দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে" তবে ঐ স্থান পরিত্যাগ করা পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। (মুসলিম)
"আল্লাহ্‌র বানী" দ্বারা শারঈ এবং কাওনী বানী উদ্দেশ্য। আর আল্লাহর কথা হল তার গুনাবলীর অন্যতম। আর তার গুনাবলী কোন সৃষ্ট বস্তু নয়। কোন সৃষ্টির নিকট এ সকল বিষয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করা অবৈধ।

২ - সৃষ্টির নিকট আশ্রয় কামনা করা ঐ বিষয়ে যার উপর সে ক্ষমতাবান। এধরনের আশ্রয় গ্রহন জায়েজ।
দলীল: নবী করীম (সা:) ফিৎনার কথা উল্লেখ পূর্বক বললেন: সূতরাং যে ব্যক্তি উহা হতে আশ্রয় স্থল পাবে সে যেন তার আশ্রয় গ্রহন করে। (বুখারী ও মুসলিম)
যদি আমার নিকট কোন ডাকাত উপস্থিত হয় এবং আমি এমন কোন ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহন করি যে আমাকে তাদের হাত থেকে মুক্তি দিতে স্বক্ষম তবে এতে কোনই দোষ নেই।

ঙ) গাইরুল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য তলব এবং ফরিয়াদ করা (বড় শির্ক)। উহা দুই প্রকার:
১ - কোন সৃষ্টির নিকট এমন বিষয়ে ফরিয়াদ করা(বিপদাপদে উদ্ধার প্রার্থনা করা) এবং সাহায্য প্রার্থনা করা যে ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেউ ক্ষমতা রাখে না। আর তা এজন্য যে, যার নিকট সাহায্য ও ফরিয়াদ করা হয়েছে - সে মৃত্যু বরন করেছে অথবা অনুপস্থিত রয়েছে। যেমন কেউ মৃত্যু ব্যক্তির নিকট ফরিয়াদ করে এই উদ্দেশ্যে যে সে তার বিপদ দূরভীত করবে। অথবা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ডাকে যাতে করে সে তাকে আরোগ্যদান করে। অথবা এজন্য যে, যে বিষয়ে অপরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা হয়েছে সে বিষয় দান করা বা অপসারন করার ক্ষমতা মূলতঃ আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কেউ রাখে না। যেমন কেউ যদি উপস্থিত জিবীত ব্যক্তির নিকট বৃষ্টি বর্ষনের জন্য ফরিয়াদ করে। এগুলো সবই বড় শির্কের অন্তর্ভূক্ত।
ইস্তেআনাহ্‌ (الإستعانة) এর অর্থ হল: কোন কাজে সাহায্য-সমর্থন তলব করা।
ইস্তেগাছাহ্‌ (الإستغاثة) এর অর্থ হল: গাওছ তলব করা। অর্থাৎ বিপদাপদের অপসারন প্রার্থনা করা।
নবী (সা:) ইবনে আব্বাস (রা:) কে তার এক ওসীয়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন এই মর্মে যে, তিনি যেন চাওয়া-পাওয়া, সাহায্য তলব, বিপদাপদ অপসারন - এগুলো সবই একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটেই নিবেদন করেন। তিনি (সা:) বলেন: (إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بـــالله) অর্থাৎ- "তুমি যখন চাইবে তখন আল্লাহ্‌র কাছেই চাইবে, আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহ্‌র নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করবে (হাদীসের শেষ পর্যন্ত){তিরমিযী, আহমাদ}
আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦

"তুমি আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন বস্তুকে ডাকবে না যে তোমার উপকার কিংবা ক্ষতি কোনটিই করতে পারে না। যদি তুমি তাই কর তবে তুমি নিশ্চিত ভাবেই জালেমদের মধ্যে গন্য হবে। (ইউনুস: ১০৬)।
আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেন:

وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعَآئِهِمۡ غَٰفِلُونَ ٥

এবং ঐ ব্যক্তির চেয়ে আর কে বেশী পথভ্রষ্ট যে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন ব্যক্তিদেরকে আহবান করে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা তাদের ঐ আহবান থেকে সম্পূর্ন বেখবর রয়েছে।? (আহকাফ : ৫)

ইমাম তাবারানী স্বীয় সনদে বর্ননা করেন যে, নবীর (সা:) যুগে এমন একজন মুনাফিক ছিল যে মুমীনদেরকে (কথায় ও কাজে) কষ্ট দিত। তাই তাদের কেউ কেউ বললেন: চল আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নিকট গিয়ে এই মুনাফেক থেকে তাঁর কাছে ফরিয়াদ করি। (এতদ শ্রবনে) নবী (সা:) বললেন: আমার নিকট ফরিয়াদ করা বৈধ নয় বরং ফরিয়াদ (বিপদাপদ অপসারনের প্রার্থনা) একমাত্র আল্লাহর নিকটেই করতে হবে।" [১]

২- মাখলুকের নিকটে এমন বিষয়ে সাহায্য তলব এবং ফরিয়াদ করা যার সে ক্ষমতা রাখে (ইহা বৈধ) এর দলীল হল আল্লাহ তাআলার এই বানীটি:

(وتعاونوا بالبر والتقوى)

"আর তোমরা পরস্পরে সহযোগিতা কর নেকী এবং পরহেজগারিতার কাজে"। (মায়েদাহ্:২)।

আল্লাহ তাআলা মুসার (আ:) কিচ্ছায় বলেন:

فَٱسۡتَغَـٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنۡ عَدُوِّهِۦ

অত:পর যে তার (মুসার) নিজ দলের লোক সে তার শত্রূদলের লোকটির বিরূদ্ধে তার (মূসার) কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। (কাসাস - ১৫)

অনুরূপ ভাবে যে কোন ব্যক্তিও স্বীয় সাথীদের সাহায্য গ্রহন করা বৈধ। যেমন- যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যার উপর মাখলুক সামর্থ রাখে।

চ) গাছ, পাথর, কবর ইত্যাদী দ্বারা ইবাদত হিসাবে তাবার্‌রক গ্রহন করা (বড় শির্কের অন্তর্ভূক্ত)।

আল্লাহতাআলা বলেন:

أَفَرَءَيۡتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلۡعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ
وَلَهُ ٱلۡأُنثَىٰ ﴿٢١﴾ تِلۡكَ إِذً۬ا قِسۡمَةٌ۬ ضِيزَىٰٓ ﴿٢٢﴾ إِنۡ هِىَ إِلَّآ أَسۡمَآءٌ سَمَّيۡتُمُوهَآ
أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَـٰنٍ‌ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ
وَمَا تَهۡوَى ٱلۡأَنفُسُ‌ۖ وَلَقَدۡ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلۡهُدَىٰٓ ﴿٢٣﴾

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওয্যা সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি মানত সম্পর্কে? পুত্র সন্ত ান কি তোমাদের জন্যে এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্‌র জন্যে? এমতাবস্থায় এটা তো খুবাই অসঙ্গত বন্টন। এগুলো কতগুলো নাম বৈ কিছু নয় যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষগন রেখেছো এবং এর সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল নাযিল করেননি। তারা অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরন করে। অথচ তাদের কাছে তাদের পালন কর্তার পক্ষ থেকে পথ নির্দেশনা এসেছে। (নাজম : ১৯-২৩)

মুশরিকগন এই সমস্ত মূর্তী দ্বারা তাবাররূক অর্জন করত। "লাত" একজন সৎ ব্যক্তির নাম। তিনি মৃত্যু বরন করেন। পরে তারা তার নিকটে ইবাদতের উদ্দেশ্যে অবস্থান করতে শুরু করে। "উয্যা" একটি বৃক্ষ যা মক্কা এবং তায়েফের মধ্যে অবস্থিত। এর চতুর্পাশে দেয়াল উঠিয়ে ঘর তৈরী করা হয়েছে। আর "মানত" হল মক্কা মদীনার মাঝে অবস্থিত একটি মূর্তী।

[১] হাদীছটি যঈফ সনদে বর্ণিত। দ্রষ্টব্য: যঈফু আবু দাউদ হা/ মাজমাউয্‌যাওয়ায়েদ (১০/১৫৯) আন্ নাহ জুস্ সাদীদ (১৬১)

আবূ ওয়াকেদ লাইসী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রসূলুল্লাহ্‌র (সা:) সাথে হুনাইনের যুদ্ধে বের হলাম। তখন আমরা ছিলাম কুফর যুগের নিকটবর্তী নতুন মুসলমান। তদানিন্তন কালে মুশরিকদের একটি কূলবৃক্ষ ছিল যার পাশে তারা উপবেশন করত এবং তাতে নিজেদের সমরাস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। উহাকে "যা-তু আন্‌ওয়াত" বা ঝুলন্ত বস্তুরাজী সমৃদ্ধ বৃক্ষ বলা হত। একদা আমরা এমনই একটি কুল বৃক্ষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। আমরা বললাম হে আল্লাহ্‌র রসূল, তাদের যেমন "যা-তু আনওয়াত" আছে, আমাদের জন্যও তেমনি একটি "যা-তু আনওয়াত" নির্দিষ্ট করে দিন। তখন রসূলুল্লাহ্‌ বললেন: আল্লাহু আকবার! এগুলি পূর্ববর্তীদের রীতি নীতির কথা তোমরা বললে। যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি "তোমরা ঐরূপ কথাই বললে, যে রূপ বনী ইসরাঈলগণ হযরত মূসা (আ:)কে বলেছিল "আপনি আমাদের ইবাদতের জন্য মাবূদ ঠিক করে দিন যেমন তাদের পূজা অর্চনার জন্য মাবূদ সুনির্দিষ্ট রয়েছে, হযরত মূসা (আ:) বললেন তোমরা অজ্ঞ জাতি (৭:১৩৮) তার পর রসূলুল্লাহ্‌ (সা:) বললেন: "দেখ তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি নীতি অনুসরন করে চলবে" {হাদীছটি ইমাম তিরমিযী বর্ননা করত: উহাকে ছহীহ বলেছেন, অত্র হাদীছটিকে ইমাম আহম্মদ ও বর্ননা করেছেন}

ছ) গাইলুল্লাহকে ভালোবাসা (বড় শির্ক)। উহা দুই ভাগে বিভক্ত:

প্রথমঃ ইবাদত হিসাবে মহব্বত করা। আর এই প্রকৃতির মহব্বত বিনয় ও তাযীমকে আবশ্যক করে। উহা মানুষের অন্তরে প্রেমিকের সম্মান যোগায় যার ফলে সে তারই আদেশ নিষেধকে বাস্ত বায়িত করে। এই ধরনের মহব্বত আল্লাহ্‌ তাআলার জন্য খাস। সূতরাং যে ব্যক্তি ইবাদত হিসাবে আল্লাহ্‌র সাথে অপর কাউকে ভালোবাসবে সে বড় শির্ক কারী মুশরিক বলে গন্য হবে। এই মহব্বতকেই আলেম সম্প্রদায় "খাস মহব্বত" বলে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ

মানুষের মধ্যে কিছুসংখক এমন আছে যারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহন করত: ওদেরকে আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার মত ভালোবাসে। (বাকারাহ্‌ ১৬৫)

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করবে যার মহব্বত আল্লাহ্‌র মহব্বতের সমতূল্য (তার নিকট) তাহলে সে বড় শির্ককারী মুশরিক বলে গন্য হবে। বস্তুত: আল্লাহ্‌র ভালোবাসাকে অপর ব্যক্তির ভালোবাসা ও যাবতীয় কর্মের উপর অগ্রাধিকার দেয়া ওয়াজিব। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন:

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ
أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ
ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নি, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর - আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয় তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌র বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ্‌ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। (তাওবাহ্‌ : ২৪)

নবী (সা:) এরশাদ করেন: তিনটি বৈশিষ্ট যার মাঝে থাকবে সে উহা দ্বারা ঈমানের আস্বাদন গ্রহন করবে।

১ - আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সকলের চেয়ে অধিক প্রিয় হওয়া।

২ - একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে ভালবাসা ।

৩ - কুফরী থেকে মুক্তি প্রাপ্তির পর আবার উহাতে ফিরে যাওয়াকে এমনভাবে খারাপ জানা যেমন আগুনে নিক্ষেপ হওয়াকে খারাপ জানে। (বুখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয়: এমন ভালবাসা যা প্রকৃত পক্ষে ইবাদত নয়। ইহা কয়েক প্রকারঃ

- আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্র ব্যাপারে কাউকে ভালবাসা। অর্থাৎ: ঐ ভালবাসার উদ্রেক হয় এক মাত্র আল্লাহ্র ভালবাসার কারনেই। অর্থাৎ: ঐ ভালবাসার পাত্রটি আল্লাহ্র নিকট প্রিয়। আর উহা মানুষও হতে পারে যেমন নবী, রসূল ও সৎ কর্মশীল ব্যক্তিগন। অথবা আমলও হতে পারে যেমন: নামায, (রোযা, হজ্ব) যাকাত। ভালবাসার এই প্রকারটি প্রথম প্রকার ভালবাসা তথা আল্লাহ্র ভালবাসারই মধ্যে গন্য।

– দয়া ও রহমতের ভালবাসা। যেমন সন্তানদেরকে, ছোটদেরকে, দূর্বলদেরকে ভালবাসা।

– সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদনের ভালবাসা যা ইবাদতের সীমায় পৌছায় না। যেমন: পিতা, শিক্ষক, প্রধান দায়িত্বশীল - এদরেকে ভালবাসা।

– অভ্যাসগত ভালবাসা।যেমন খাদ্য, পানীয়, এবং পোশাক পরিচেছদকে ভালবাসা।

ভালবাসার এই প্রকার গুলো যদি আল্লাহ্কে ভালবাসা ও তার আনুগত্য করতে সহায়ক হয় তবে এগুলো ইবাদতের মধ্যে পরিগনিত হবে। যেমন কোন ব্যক্তি তার পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের নিমিত্ত তাকে ভালবাসলো - তবে এ কাজ ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। আর তার এই মহব্বত যদি তাকে আল্লাহ্র ভালবাসা ও তার আনুগত্য হতে বাধা প্রদান করে তবে ইহা নিষিদ্ধ বিষয়ে পরিগনিত হবে। যেমন: কিছু লোক ইদানিং কালে ফুটবল খেলে, নানা ধরণের প্রতিযোগিতাকে এমন ভাবে ভালবাসে যে, ইহা তাকে বাধ্য করে নামাযকে তার নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত করতে অথবা একেবারেই নামায পরিত্যাগ করতে।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া তার ফাতাওয়ায় বলেন: একথা জেনে নাও যে, আল্লাহ্র দিকে অন্ত রকে ধাবমান কারী বস্তু হল তিনটি: ১) ভালবাসা, ২) ভয় ভীতি, ৩) আশা-আকাংখা। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হল ভালবাসা আর উহা বিশেষ ভাবে উদ্দেশ্য। কারন উহা দুনিয়া ও আখেরাতে উদ্দেশ্য। কিন্তু ভয় ভীতি এর বিপরীত কারন উহা পরকালে দূরীভূত হয়ে যাবে। এ ভালবাসাই বান্দাকে তার মাহবুবের দিকে পদচারনা করায়। আর তার দিকে তার পদচারনার গতি ঐ ভালবাসার দূর্বলতা ও শক্তি অনুযায়ীই হয়ে থাকে। আর ভয়ভীতি তাকে বাধা দেয় ঐ পথ হতে বের হতে এবং আশা-আকাংখা তাকে পরিচালনা করে। ইহা একটি বিরাট মূল নীতি যার প্রতি সচেতনতা প্রতিটি বান্দার উপর ওয়াজিব, কারন ইহা ব্যতীত কোন ইবাদত-ই সহীহ্ শুদ্ধ হয় না।

তিনি আরো বলেন : প্রত্যেক ব্যক্তির ভয়-ভীতি ও আশা-আকাংখা এক হওয়া বাঞ্চনীয়। সুতরাং এই দুটির কোন একটি যদি বিজয়ী হয় (অর্থাৎ একটি কম অন্যটি বেশী) তবেই সে ধ্বংশ হয়ে যাবে। ইহা ইমাম আহমাদ (রহ:)ও এধরণের কথা ব্যক্ত করেছেন। কারন যার ভীতি জয় লাভ করবে সে এক আল্লাহ্র রহমত হতে একপ্রকার নিরাশায় ভোগ করবে। আর যার আশাকাংখা প্রাধান্য পাবে সে আল্লাহ্র শাস্তি হতে একপ্রকার নিরাপদে আছে বলে মনে করবে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে তার ধ্বংশ অনিবার্য।

জ) মাযার ও কবরের জন্য কুরবানী, হাদিয়া, পেশ করা এবং উহার তাযীম করা (বড় শির্ক)।

"কুরবানী" কুরবান শব্দের বহুবচন: কুরবানী হল প্রত্যেক ঐ বস্তু যার মাধ্যমে নৈকট্য তলব করা হয় যেমন: নযর-নেয়ায, পশু যবেহ্, খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদীর মাধ্যমে নৈকট্য কামনা করা হয়।

"মাযারাত" মাযার শব্দের বহুবচন - আর উহা হল যিয়ারত কৃত বস্তু। যেমন: কবর, পুরাতন কোন নির্দশন, বিভিন্ন স্থান ইত্যাদী, যা ইবাদতের উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা হয়। এই সমস্যাটি অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছে। (যাকে আল্লাহ রহম করেছে সে ব্যতীত)। ইহা এজন্যই ছড়িয়েছে কারন নবীর আদর্শের বিপরিত করা হয়েছে ঐ পদ্ধতির ক্ষেত্রে, যে পদ্ধতিতে কবরগুলি থাকা ওয়াজেব ছিল। আর তাহল: উহার উপর কোন ঘর তৈরী না করা, কোন মসজিদ প্রতিষ্ঠিত না করা। কিন্তু যখনই (নবীর (সা:) তরীকার বিরোধীতা করে)ঐগুলোর উপর কুব্বা (গম্বুজ) এবং মসজিদ নির্মিত হল তখনই মুর্খগন ধারনা করল যে, উহাতে দাফন কৃত ব্যক্তিগন যে কোন ধরণের উপকার বা অপকার সাধনে সক্ষম। তারা ফরিয়াদকারীর ফরিয়াদ শুনেন এবং বিভিন্ন প্রয়োজনাদী পুরন করেন। সুতরাং তারা তাদের নিকট নযর-নেয়ায, কুরবানী পেশ করতে লাগল। এমনকি ঐ কবর গুলি উপাসনার স্থানে পরিণত হল। অথচ নবী (সা:) হাদীছে দোয়া করেছেন এই বলে: (اللـــهم لاتجعل قبري وثنـــاً يُعْبَـــدْ) "হে আল্লাহ্ আমার কবরকে আপনি উপসনাগারে রুপান্তরিত করিও না"। (আহমাদ, মালেক)। তিনি এই দোয়া এ জন্যই করেছিলেন কারন তিনি জানতেন যে, অন্যান্যদের কবরে ঐ ধরনের কিছু ঘটবে। আর বাস্তবেও অনেক ইসলামী দেশে কবর পুজা হয়েছে এবং হচ্ছে।

অবশ্য নবীর (সা:) কবরকে আল্লাহ্ তাঁর দোয়ার বরকতে রক্ষা করেছেন। যদিও সেখানে মূর্খ এবং বিদআতীদের দ্বারা তাঁর (সাঃ) আদর্শ বিরোধী কিছু কাজ হচেছ। কিন্তু তারা তাঁর (সা:) কবরের ধারে কাছে যেতে অক্ষম। কারন তার কবরটি (আয়েশার) গৃহে অবস্থিত মসজিদে নয়। আর উহা চারপাশে দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত।

উল্লেখ্য যে, যদি কোন মসজিদের মধ্যে কবর পাওয়া যায়। তবে দেখতে হবে কোনটি প্রথম নির্মিত হয়েছে। যদি মসজিদই সর্ব প্রথম হয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে মৃতকে দাফন করা হয়। তবে ঐ কবরের অবশিষ্ট হাড় হাড্ডি তালাশ করে উহা মসজিদ হতে বের করা দাফনকারীদের উপর ওয়াজিব। কিন্তু যদি কবরই প্রথম নির্মিত হয় অত:পর উহার উপর মসজিদ কিংবা গম্বুজ নির্মিত হয় তবে উহা ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব হবে ঐ ব্যক্তির উপর যে উহা নির্মান করেছে।

হযরত আয়েশা (রা:) হতে বর্নিত তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সা:) যখন (মৃত্যু শয্যায়) অসুস্থ ছিলেন: তখন তিনি একটি চাদর স্বীয় চেহারা মুবারকে রাখতেন, অসুবিধা বোধ করলে তা সরিয়ে নিতেন। এমতাবস্থায় তিনি একদা বললেন: "ইয়াহুদ ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশম্পাত। কেননা তারা তাদের নবীদের কবর গুলিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে।" তিনি স্বীয় উম্মতকে সেই ইয়াহুদ-নাসারাদের কর্ম হতে সতর্ক করার জন্যই তা বলেছেন। (রাবী বলেন:) যদি তাই না হত তবে তাঁর কবরকে প্রকাশ করা হত কিন্তু তা করা হয়নি কেননা তিনি ভয় পেয়ে ছিলেন উহাকে মসজিদ বানিয়ে ফেলার। (বুখারী ও মুসলিম)।

অর্থাৎ রাসূল (সা:) মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ঐ সমস্ত লোকদের কৃত কর্ম হতে তার উম্মতকে সতর্ক করেছেন। কারন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে অচিরেই তিনি মৃত্যু বরন করবেন। এবং দুরবর্তী ভবিষ্যতে হলেও এ ধরণের কাজ সংঘঠিত হবে। যদি এই ধরনের সতর্ক বানী এবং তা মসজিদে রূপান্তরিত করার ভয় না হত তবে নবী (সা:)কে ঘরের বাইরে বাকীউল গারকাদ গোরস্থানে দাফন করা হত। কিন্তু ঘরই হল তার জন্য বেশী হেফাজতকারী এবং উহা মসজিদে পরিনত হওয়া থেকে বহু দুরে অবস্থান কারী।

তাঁকে ঘরে দাফন করার পিছনে দ্বিতীয় কারন হল: তিনি নিজে-ই হাদীছ শুনিয়েছিলেন যে, প্রত্যেক নবীকে তাঁর মৃত্যুর স্থানেই দাফন করা হয়েছে। সাহাবীগন (রা:)ও নবী (সা:)কে তার ঘরেই দাফন করার ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌছেছিলেন। কারন বাইরে থাকলে তাঁরাও উহা মসজিদে রূপান্তরিত

হওয়ার ভয় করেছিলেন। অবশ্য একটি সমস্যা থেকেই যায় তা হল: নবী (সা:) এর কবর বর্তমানে তো মসজিদের মধ্যভাগে - তাহলে এর জওয়াব কি?

এর জওয়াব কয়েকভাবে দেওয়া যায় :

১. মসজিদটি মূলত: কবরের উপর নির্মান করা হয়নি বরং এ মসজিদ নির্মিত হয়েছে নবী (সা:) এর জিবদ্দাশায়।

২. নবী (সা:)কে মসজিদেই দাফন করা হয়নি। কাজেই একথা বলার অবকাশ নেই যে ইহাও সৎব্যক্তিদেরকে মসজিদে দাফন করায় কুপ্রথার অন্তর্ভূক্ত। বরং নবী (সা:)কে তাঁর ঘড়ে দাফন করা হয়েছে।

৩. রসূল (সা:) এর ঘরগুলোকে- যার অন্যতম হল আয়েশার ঘরটি (যেখানে নবী (সা:) শায়িত রয়েছেন) মসজিদে প্রবেশ করানো সাহাবীদের যৌথ সিদ্ধান্তে হয়নি বরং তাদের অধিকাংশের মৃত্যুর পর হয়েছে। তখন তাঁদের অল্প কয়েকজন মাত্র বেঁচে ছিলেন। উহা ঘটেছিল ৯৪ হি: সনে মসজিদ সম্প্রসারন কালে। বস্তুত: এই কাজটি সাহাবীদের অনুমতি বা তাদের যৌথ সিদ্ধান্তে হয়নি। তাদের কেউ কেউ উহাতে দ্বিমতও পোষন করেছিলেন এবং বাধা দিয়েছিলেন । তাবেয়ীনদের মধ্যে সাঈদ বিন মুসাইয়েব তাদের অন্যতম।

৪. কবরটি মূলত: মসজিদে নেই। কারন উহা মসজিদ হতে সম্পূর্ণ পৃথক রূমে রয়েছে। আর মসজিদকে ওর উপর বানানো হয়নি। এজন্যই এই স্থানটিকে তিনটি প্রাচির দ্বারা সংরক্ষিত ও বেষ্টিত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাচিরকে এমন একটি দিকে রাখা হয়েছে যা কিবলা হতে বিপরীত সাইডে রয়েছে। এবং উহার এক সাইড উল্টা দিকে রয়েছে, যাতে করে কোন সানুষ নামায পড়া কালীন উহাকে সম্মুখীন না করতে পারে কারন উহা কিবলা হতে এক পার্শে রয়েছে।

আশাকরি উক্ত আলোচনা দ্বারা ঐ সমস্যা দূরীভূত হয়েছে যা দ্বারা কবর পন্থীগন দলীল গ্রহন করে এইমর্মে যে, নবী (সা:) এর কবরে মসজিদ বানানো রয়েছে।

ঝ) গাইরূল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নযর-নিয়ায (মান্নত) করাঃ

নযর-নিয়ায ঐ বস্তুকে বলে যা প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোন বস্তুকে নিজের উপর অবধারিত করে। যেমন: উমুক ব্যক্তির জন্য নযর মেনেছি। অথবা এই কবরের জন্য আমি মান্নত মেনেছি, অথবা জিবরীল (আ:) এর জন্য আমার মানত রয়েছে- উদ্দেশ্য হল এগুলোর মাধ্যমে তাদের নৈকট্য অর্জন করা। নিঃসন্দেহে ইহা শির্কে আকবরের অন্তর্গত। এ থেকে তওবা করা আবশ্যক। আর এই নযর কোন ক্রমেই ধর্তব্য হবে না। উহা পূর্ণ না করলে কাফফারাহ্‌ও ওয়াজেব হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ

তোমরা যাই খরচ কর বা নযর মান্নত কর না কেন আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে অবগত থাকেন। (বাকারাহ : ২৭০)

কোন বস্তুকে আল্লাহ্‌র ইলমের সাথে সম্পর্কিত করা হলে সে বিষয় হল ছওয়াব অর্জনের স্থান। আর যে বিষয়ে ছওয়াব পাওয়া যায় সেটাই তো ইবাদত। আর ইবাদত মাত্রই গাইরূল্লাহর জন্য সম্পাদন করা অবৈধ।

হযরত আয়েশা (রা:) হতে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা:) বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার মানত করে সে যেন আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে (অর্থাৎ তার মানত পুরা করে)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করার মানত মানে তবে সে যেন সে যেন তার অবাধ্যতা না করে (অর্থাৎ উহা পুরা না করে)। (বুখারী)

গাইরুল্লাহ্‌র নামে নযর ও অবাধ্যতার নযরে পার্থক্য হল যে, গাইরুল্লাহ্‌র জন্য যে নযর মানা হয় সেটি মুলত: আল্লাহর জন্য নযর নয়। পক্ষান্তরে অবাধ্যতার নযর আল্লাহ্‌র নামে হয়ে থাকে, তবে উহা আল্লাহর অবাধ্য কাজের উপর হয়ে থাকে। যেমন কেউ বলল: আমি আল্লাহ্‌র নামে মানত মেনেছি স্বীয় পিতার অবাধ্যতা করব। এক্ষেত্রে নযর (মানত) আল্লাহ্‌র জন্যই হয় কিন্তু বিষয়টি আল্লাহ্‌র "অবাধ্যতা" বলে গন্য হয়। এই ধরনের নযর ধর্তব্য হয়। তবে উহা পূর্ণ করা বৈধ নয়। আর তার উপরে শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়। পক্ষান্তরে গাইরুল্লাহ্‌র নামে নযর মানা এর সম্পূর্ণ বিপরিত।

ঞ) গাইরুল্লাহর নিকট শাফায়াত (সুপারিশ) তলব করা (বড় শির্ক)।

শাফায়াতের সংজ্ঞাঃ শাফায়াত হল কোন উপকার সাধন অথবা বিপদ দূরীভূত করার জন্য কারো মাধ্যস্থতা অবলম্বন করা। গাইরুল্লাহ্‌র নিকট উহা প্রার্থনা করা শির্ক। যেমন মুশরিকগন মূর্তীর পূজা করত আর বলতো যে, ইহারা আল্লাহ্‌র নিকট তাদের জন্য সুপারিশ কারী। আর ইহাই হল অতীতের মুশরিকদের মূল শির্ক। কিন্তু ইদানীং কালের শির্ক হল: পাপ এবং অবাধ্যতার কাজে মাখলুকের অনুসরন করা। আমরা এমন কতিপয় ব্যক্তিকে দেখতে পাই যারা তাদের নেতাদেরকে আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী সম্মান করে যদি তারা তার (কথা বা কাজের) স্বীকৃতি দেয়। তাদের সম্মান-শ্রদ্ধা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বীয় নেতাকে রূকু অথবা সিজদা পর্যন্ত করে থাকে।

(যদি) তদেরকে বলা হয়- এরা তো তোমাদের মতই মানুষ। এবং সত্যিকার অর্থে তাদের কোনই অংশ নেই না আসমানে না যমীনে। এবং তারা (তোমাদের জন্য) সুপরিশ করারও অধিকার রাখে না, তাহলে তোমরা কেন তাদের কাছে ধর্ণা দাও? তারা তাদের ঐ কৃতকর্ম দ্বারা ধারনা করে যে তারা তাদেরকে তাযীম করছে অথচ বাস্তবে তারা আল্লাহকে অবমাননা কারী। তারা বলে থাকে:

مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ

আমরা তাদের ইবাদত এজন্যই করি যাতে করে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। (যুমার -৩)

কিন্তু মুশরিকদের অনুমান ভিত্তিক এই শাফায়াত কিয়ামত দিবসে কোনই উপকারে আসবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّكُمۡ وَمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمۡ لَهَا وَٰرِدُونَ ﴿٩٨﴾
لَوۡ كَانَ هَٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةٗ مَّا وَرَدُوهَاۖ وَكُلّٞ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٩٩﴾

নিশ্চয় তোমরা ও তোমরা যাদের ইবাদত কর (সকলে মিলে) জাহান্নামের ইন্ধন হবে। এবং তোমরা ঐ জাহান্নামে পতিত হবে। তারা যদি সত্যিকার অর্থেই উপাস্য হত তবে তারা জাহান্নামে পতিত হত না। আর তারা সকলেই উহাতে (জাহান্নামে) চিরকাল অবস্থান করবে। (আম্বিয়া : ৯৮-৯৯)

তাদের উপাস্য গুলি তাদের কোন উপকার করা তো দূরের কথা তারা নিজেরাই নিজেদের কোন উপকার করতে পারবে না। তাহলে কি ভাবে তারা শাফায়াতের অধিকারী হবে। বরং তারা এবং তাদের উপাসকগন সকলে জাহান্নামে অবস্থান করবে।

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন:

قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعٗاۖ

(হে রসূল!) আপনি বলেন আল্লাহরই জন্য সমুদয় শাফায়াত। (যুমার -৪৪)

আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় নবী (সা:) কে নির্দেশ দিচেছন যেন তিনি গাইরুল্লাহ্র নিকট শাফায়াত তলব কারীকে বলে দেন যে, ওদের হাতে মূলত: কোনই কর্তৃত্ব নেই। বরং এই শাফায়াত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। তার অনুমতি ব্যতীত কারো জন্য শাফায়াত করার কোন ক্ষমতা কেউ রাখে না ।

বস্তুত আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) কোন প্রকার সুপারিশ ছাড়াই অপরাধীদের ক্ষমা করা, সৎ কর্মশীলদের মর্যাদা উন্নীত করার ব্যাপারে ক্ষমতাবান। কিন্তু তিনি (কেন শাফায়াতের অধিকার অন্যকে দিয়ে থাকেন?) এদ্বারা তিনি সুপারিশকারীর ফযীলত এবং মানুষের সামনে তার সম্মান এবং আল্লাহ্র দরবারে তার মর্যাদার বর্ননা দেয়ার ইচছা করেন।

শির্কী শাফায়াত তাওদীদের পরিপন্থী। ইহা থেকে মুক্ত থাকাই হল আসল তাওহীদ। যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করবে তার নছীবে শাফায়াত হবে না । আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَـٰعَةُ ٱلشَّـٰفِعِينَ ﴿٤٨﴾

সুপারিশ কারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। (সূরা মুদ্দাস্সির-৪৮)

আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কোন শাফায়াতই হবে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

কোন সেই ব্যক্তি রয়েছে যে তাঁর (আল্লাহ্র) নিকট তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করবে? (সূরা বাকারাহ্ : ২৫৫)

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন:

۞ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَـٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ ﴿٢٦﴾

আকাশে অনেক ফেরেস্তা এমন রয়েছে তাদের শাফায়াত কিছুই উপকারে আসবে না। যতক্ষন আল্লাহ্ যার জন্য ইচছা করেন ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন। (সূরা নাজম-২৬)

আল্লাহ্ তাআলা অত্র আয়াতে উপকার কারী শাফায়াতের শর্তগুলির বর্ননা দিয়েছেন। তা হল নিম্নরূপ:

১. সুপারিশ কারীর সুপারিশের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদন থাকা।
২. সুপারিশ কৃত ব্যক্তির উপর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি থাকা। অর্থাৎ সে তাওহীদ পন্থীদের মধ্যে থেকে হওয়া।

অতএব, (বুঝাগেল) যে শাফায়াতকে কুরআন নাকোচ করেছে উহা ঐ প্রকার শাফায়াত যার মাঝে শির্ক নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে যে শাফায়াতটিকে কুরআন সাব্যস্ত করেছে উহা ঐ প্রকার শাফায়াত যা আল্লাহ্র অনুমতি সাপেক্ষে হয়ে থাকে।

শাফায়াত দুই ভাগে বিভক্ত:

ক) শুধু মাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা:)এর জন্য নির্দিষ্ট শাফায়াত। ইহাও আবার কয়েক প্রকারঃ

১. বৃহৎ শাফায়াত, এই শাফায়াতটি হাশরের মাঠে অবস্থান কারীদের জন্য হবে। যাতে করে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ফায়সালা করেন এবং দীর্ঘমেয়াদী দন্ডায়মান হতে তাদেরকে মুক্তি দেন।

২. জান্নাত বাসীদের জন্য নবী (সা:)এর শাফায়াত। যাতে করে তারা তাতে প্রবেশ করতে পারে।

৩. নবীজির শাফায়াত স্বীয় চাচা আবু তালিবের ব্যাপারে যাতে করে তার থেকে আল্লাহ্ জাহান্নামের শাস্তিকে (কিছুটা) লাঘব করেন।

খ) ব্যাপকভাবে সমস্ত মুমিনদের জন্য নবী (সা:)এর সাধারন শাফায়াত। ইহাও কয়েক ভাগে বিভক্তঃ

১) জান্নাত বাসী কিছু লোকদের জন্য সুপারিশ করা, তাদের বিনিময় বেশী করা ও তাদের মর্যাদা উন্নীত করার জন্য।

২) ঐ গুনাহ্গার ব্যক্তিদের জন্য সুপারিশ করা যারা জাহান্নামকে ওয়াজিব করেছে এই মর্মে যে, তারা যেন জাহান্নামেই প্রবেশ করে।

৩) গুনাহগারদরে এমন শ্রেনীদের জন্য সুপারিশ করা যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। এই মর্মে (তাদের জন্য সুপারিশ করা) যে, তারা যেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

ট) গাইরুল্লাহ্কে দোয়া করা (আহবান করা) বড় শির্ক। উহা দুই ভাগে বিভক্তঃ

১) গাইরুল্লাহকে এমন ভাবে আহবান করা যা ইবাদত হিসাবে পরিগনিত। যেমন ভয়-ভীতি, আগ্রহ, মহব্বত, বিনয় ইত্যাদী মিশ্রিত দোয়া। ইহাই হল শির্ক। উসাহরন স্বরূপ: যেমন কোন মাখলুককে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় কেউ আহবান করল এমন বিষয়ে যার উপর একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ ক্ষমতা রাখে না। যেমন (বলল): যে উমুক! আমার স্ত্রীর গর্ভস্থ বস্তুকে ছেলে সন্তানে রূপান্তরিত কর ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

যাদেরকে তারা আহবান করে তারা নিজেরাই তো তাদের পালন কর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে বেশী নৈকট্য শীল। (ইসরা বনী ইসরাঈল: ৫৭)।

আত্র আয়াতে আল্লাহ্ মুশরিকদের প্রতিবাদ করেছেন যারা সৎ কর্মশীল ব্যক্তিদেরকে আহবান করে। তিনি বলেছেন তোমাদের ধারনাকৃত ওলিগণ ক্ষতিকর বস্তুকে না অপসারন করতে পারে আর না তাকে এক স্থান হতে অপর স্থানে ফিরাতে পারে। কারন তারা নিজেরাই তো আহবান ও তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে। অর্থাৎ এমন বস্তুর সন্ধান করে যা তাদেরকে আল্লাহর নিকট পৌছাতে সক্ষম। কে তাদের মধ্যে সবচেয়ে নৈকট্যশীল। এবং তারা তার রহমত কামনা করে, আর তার শাস্তিকে ভয় করে তবে (বল হে মুশরিকগন!) কেমন করে তোমরা তাদের আহবান করছ অথচ তারা নিজেরাই অপরের মুখাপেক্ষী এবং রিক্তহস্ত। যেমন কেউ কেউ ঈসা বিন মারিয়াম, ফেরেস্তা মন্ডলী, ওলী, অথবা সালেহীনকে আহবান করল (তাদের নিকটে বিপদাপদ অপসরন তলব করল) আল্লাহ্ তাআলা ঐ সমস্ত আহবান কৃতদের অবস্থা বর্ননা দিতে গিয়ে বলেন:

وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ
مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ
وَلَوْ سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا
يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

"আর তোমরা যাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত ডাক তারা খেজুরের বিচির উপরের হালকা আবরনের পরিমান বস্তুর মালিক নয়। যদি তোমরা তাদেরকে ডাক তারা তোমাদের ডাক শুনবে না। যদিও তারা শুনে কোন প্রতি উত্তর করবে না। এবং তারা কিয়ামত দিবসে তোমাদের এই শির্ককে অস্বীকার করবে। এবং তোমাকে সংবাদ দাতার ন্যায় সংবাদ পরিবেশন করবে না। (সূরা ফাতির: ১৩-১৪)

আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা অত্র আয়াতে সম্বোধন করছেন যারা গাইরুল্লাহ্কে ইবাদত বা চাওয়া পাওয়ার জন্য ডাকে এই মর্মে যে, তারা অতি সল্প বস্তুরও মালিক নয়, আর অতি সল্প বস্তু হচেছ "কিত্বমীর" তথা খেজুরের বিচি আবৃতকারী হালকা আবরন টুকু। এই সকল মৃতব্যক্তিগণ এবং অনুপস্থিতগন তোমাদের আহ্বান শুনে না। ধরেই নিলাম যে তারা তোমাদের আহবান শুনে - তবুও তারা জওয়াব দিতে অক্ষম। পক্ষান্তরে হাশর দিবসে তারা তোমাদের এই শির্ককে অস্বীকার করবে। (তাদের এই আহবানকে আল্লাহ্ শির্ক বলে অবিহিত করেছেন) এবং তোমাকে খবর দাতার মত তথা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মত খবর দিবে না।

২) এমন ভাবে আহবান করা যা ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত নয়। যেমন কোন জীবিত সৃষ্টি জীবকে ডাকা এমন বিষয়ে যা পঞ্চন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি ও অর্জন করা যায়। এধরনের আহবান জায়েয। দলীল: নবী (সা:) বলেন: (وإذا دعـــاك فأجبـــه) এবং যখন তোমাকে সে (ওলীমা অনুষ্ঠানে) ডাকবে তখন তার ডাকে সাড়া দিবে। (মুসলিম)

ঠ) গাইলুল্লাহ্র উপর ভরসা করা (বড় শির্ক)। উহা কয়েক প্রকার:

প্রথমঃ ইবাদত ও বিনয় বিজড়িত ভরসা। উহা হল ভরসাকৃত ব্যক্তির উপর সার্বভৌম ভরসা রাখা। যেমন: এই বিশ্বাস রাখা যে, তার হাতে উপকার অপকারের ক্ষমতা রয়েছে। তাই তার উপর পূর্ণাঙ্গরূপে ভরসা করে এবং সে নিজেকে তার সমীপে অভাবী মনে করে। এই ধরনের ভরসা নিরাঙ্কুশ ভাবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই হতে হবে। আর যে ব্যক্তি উহা গাইরুল্লাহর দিকে ফিরাবে সে বড় শির্কে লিপ্ত মুশরিক বলে গন্য হবে। যেমন: যারা মৃতদের মধ্যে সৎ ব্যক্তিদের উপর ও অনুপস্থিতদের উপর ভরসা করে। অথচ এধরনের কার্য কলাপ ঐ ব্যক্তি দ্বারাই সংঘটিত হওয়া সম্ভব যে বিশ্বাস করে যে, ওদের এই বিশ্ব চরাচরের উপর গোপন নিয়ন্ত্রন রয়েছে। সুতরাং ওরা মুশরিক এতে কোন সন্দেহ নেই)।

দ্বিতীয়ঃ রূযী-রূটি ও জীবিকা নির্বাহ ইত্যাদি ব্যাপারে কোন ব্যক্তির উপর ভরসা করা। ইহা ছোট্ট শির্কের অন্তর্ভূক্ত। কোন কোন বিদ্যান এটাকে গোপন শির্কের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। যেমন: কেহ ভস্বীয় চাকুরীর উপর তার রূযি-রূটির রসা করল। এজন্য অনেককে দেখতে পাবে যে সে নিজেকে অভাবীর মত সেই চাকুরির উপর নির্ভরশীল মনে করে। অতএব চাকুরি দাতার জন্য তার সকল ভালবাসা নির্ধারণ হয়। সে এরূপ খারণা করে না যে এ চাকুরি তো শুধু তার জীবিকার উপকরণ মাত্র। বরং ধারণা করে যে উহা উপকরণের ঊর্ধে।

তৃতীয়ঃ কারো উপরে ভরসা রাখা এমন বিষয়ে যার মধ্যে হস্তক্ষেপ করার দায়-দায়িত্ব তারই উপর সে ন্যস্ত করেছে। যেমন আপনি কাউকে দায়িত্ব দিলেন কোন কিছু বিক্রয় ও ক্রয় করার জন্য। এধরণের ভরসায় কোন অসুবিধা নেই। কারন সে একথা জেনে শুনেই তার উপর ভরসা করেছে যে তার মর্যাদা তার উপরে সুউচ্চ। নবী (সা:) আলী বিন আবু তালিবকে তার কুরবানীর পশুর বাকী গুলোকে যবেহ করার ওকালতী দিয়েছিলেন। (মুসলিম শরীফ) আবু হোরায়রাকে ছাদাকাতূর ফিৎরের উপর পাহারাদার নিযুক্ত করেছিলেন । (বুখারী)
আল্লাহ্‌র উপর ভরসা হল সবচেয়ে উচ্চ একটি অবস্থান। প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রই উচিত তার প্রতিটি কাজে আল্লাহ্‌র উপর ভরসাশীল হওয়া।

ড) (الطِّيَرَة) কূলক্ষন (বড় শির্কের অন্তর্গত)ঃ

ইহা طَيْرٌ শব্দ হতে নির্গত। (আর طَيْرٌ অর্থ হল পাখি) আরবগন পাখি দ্বারা অলক্ষন - কুলক্ষন নির্ধারন করত। পাখি উড়ানোর মাধ্যমে ইহা একটি বিশেষ পদ্ধতি যা তাদের নিকট পরিচিতি ছিল।
পারিভাষিক অর্থ : طيرة হলঃ দৃশ্যমান, কিংবা শ্রত কোন কথা অথবা কোন জানা ও নির্ধারিত বস্তু দ্বারা কূলক্ষন নির্ধারন করা।
শ্রূত বস্তু দ্বারা কূলক্ষন নির্ধারন যেমন: কেউ শুনতে পেল একজন অপর জনকে বলছে হে ক্ষতিগ্রস্থ, হে অকৃতকার্য (ইত্যাদি) তখন সে ওটাকেই কুলক্ষন মনে করে বসল। দৃশ্যমান কোন বস্তু দ্বারা কুলক্ষন নির্ধারন করা যেমন: কেউ পাখি, পশু অথবা কানা মানুষ অথবা কোন দুর্ঘটনা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করল এবং ওটাকে সে কুলক্ষন মনে করল। নির্ধারিত কোন বস্তু দ্বারা কুলক্ষন নির্ধারন করা: যেমন: কোন কোন দিন, মাস অথবা বছর অথবা কোন কোন নম্বর ইত্যাদি দ্বারা কুলক্ষন সাব্যস্ত করা।

এধরনের কুলক্ষন নির্ধারন করা দুই দিক হতে তাওহীদের পরিপন্থী:

প্রথম দিক : এজন্যই উহা তাওহীদের পরিপন্থী কারন কূলক্ষন নিরূপনকারী আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করা পরিত্যাগ করেছে এবং গাইরুল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেছে।
দ্বিতীয় দিক: এজন্যই উহা তাওহীদের পরিপন্থী কারন সে এমন বস্তুকে আঁকড়ে ধরেছে যার কোনই বাস্তবতা নেই। বরং উহা মাত্র ধারনা ও খেয়াল মাত্র। তার ভাগে যা জুটবে তার মধ্যে ও ঐ ধারনা-খেয়ালের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি? এভাবে কুলক্ষন সাব্যস্ত করা হারাম এবং তাওহীদের পরিপন্থী।

কুলক্ষন সাব্যস্তকারী ব্যক্তির দুটি অবস্থাঃ

প্রথমত: সে তাকে বড় মনে করবে এবং এই কুলক্ষনের প্রতি লক্ষ্য করে উদ্দেশিত কর্ম পরিত্যাগ করবে। তবে ইহাই হবে গুরূতর কুলক্ষন নির্ধারন।
দ্বিতীয়ত: কাজ করে যাবে তবে একটু চিন্তিত হবে ও ভারাক্রান্ত হবে। এবং ধারনাকৃত কুলক্ষীটির কুপ্রভাবের ভয় করবে। ইহা পূর্বাপেক্ষা সহজ কিন্তু উভয়টিই তাওহীদের মাঝে ক্রটি আনায়ন কারী

এবং বান্দার জন্য ক্ষতি কারক। কেননা তাওহীদ হল ইবাদত ও সাহায্য তলব করা। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন: (إياكَ نَعْبُدُ وَإيـــَّاكَ نَسْـــتَعِيْنَ) আমরা নিশ্চয় আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করি (ফাতেহা : ৪)।
এবং যেদিকে সে ইচছা করেছে সেদিকে তার পদযাত্রা করা উচিত প্রশস্ত বক্ষ নিয়ে, আল্লাহ্র উপর পূর্ণাঙ্গ ভরসা রেখে এবং তার সাথে সুধারনা পোষণ করে।

হযরত আনাস (রা:) হতে বর্নিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেন: ব্যধির কোন সংক্রামতা নেই অলক্ষন সুলক্ষন এরও কোন অস্তিত্ব নেই। তবে আমার নিকট "ফাল" পছন্দনীয়। তারা (সাহাবীগন) জিজ্ঞাসা করলেন: "ফাল" কাকে বলে? তদুত্তরে তিনি বললেন উহা হল পবিত্র বাক্য। (বুখারী ও মুসলিম)।
অত্র হাদীছে কূলক্ষন ও তার প্রভাব উভয়টিকে নাকোচ করা হয়েছে। (আরো বলা হয়েছে যে) নবী (সা:)কে পবিত্র বানী আনন্দিত করত। কারন উহাতে মনের ভিতর প্রফুল্লতা আসে এবং যে দিকে যাওয়ার প্রচেষ্টা করে ওদিকেই পদ যাত্রা করায়। সুতরাং ইহা অলক্ষন কুলক্ষনের অন্তর্ভূক্ত নয়। কারন ইহা প্রভাবিত করে না। বরং ইহা আরো স্থীরতা, অগ্রসরতা, কাজের প্রতি মনোনিবেশকে বৃদ্ধি করে।
হযরত উরওয়া বিন আমের (রা:) হতে বর্নিত তিনি বলেন: রসূলের (সা:) নিকটে অলক্ষন সুলক্ষনের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন: এগুলোর মধ্যে উত্তম বিষয় হল ফাল গ্রহন। ইহা মূলত: কোন মুসলিমকে (তার কর্মস্থল হতে বা সিদ্ধান্ত হতে) ফিরায় না। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অপছন্দ বস্তু দর্শন করে তাহলে সে যেন বলে:

(اللهم لاَيَأْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ إلاَّ أنتَ ، ولاَيَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إلاَّ أنتَ ، ولاحول ولا قوة إلا بِكَ)

হে আল্লাহ্! আপনি ছাড়া কল্যান আনয়ন কারী কেউ নেই এবং মন্দকে প্রতিহত কারী আপনি ব্যতীত কেউ নেই। আর গুনাহ্ হতে বিরত থাকা এবং আনুগত্যের উপর অটল থাকার সামর্থ আপনার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। (আবু দাউদ)।
অত্র হাদীছ প্রমান করে যে, যাকে অলক্ষী-কুলক্ষী (স্বীয় কর্ম বা সিদ্ধান্ত হতে) ফিরিয়ে দেয় সে (প্রকৃত) মুসলিম নয়। কিন্তু তবুও যদি অলক্ষী-কুলক্ষী কোন মুসলিম ব্যক্তির অন্তরে খটকা জাগায় এর জন্য নবী (সা:) ঔষধ বাতলিয়ে দিয়েছেন। আর তাহল উক্ত হাদীছে উল্লেখিত যিক্র (দু'আ)।

হযরত ইবনে আমর হতে বর্নিত নবী (সা:) বলেন: যে ব্যক্তিকে অলক্ষী-কুলক্ষী স্বীয় প্রয়োজন হতে ফিরিয়েছে সে শির্ক করেছে। তারা (সাহাবীগন) জিজ্ঞাসা করলেন: উহার কাফ্ফারাহ্ কি? তিনি (সা:) বললেন তা হল এই দু'আটি বলা:

(اللهم لاخَيْرَ إلاَّ خَيْرُكَ ، ولاطِيْرَ إلاَّ طِيْرُكَ ، ولا اله غَيْرُكَ)

"হে আল্লাহ্! তোমার কল্যান ব্যতীত আর কোন কল্যান নেই। তোমার পক্ষ থেকেই অকল্যান হয়ে থাকে অন্য কারো পক্ষ থেকে নয়। {অর্থাৎ: অকল্যান সাধনের আপনিই একমাত্র মালিক আপনার ইচছার বাইরে কেউ অকল্যান আনায়ন করতে পারে না}আর আপনি ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই।" (মুসনাদে আহমাদ)
সুতরাং যাকেই অলক্ষী-কুলক্ষী স্বীয় প্রয়োজন হতে বিরত রাখবে সে বড় শির্ক করবে যদি তার বিশ্বাস এই থাকে যে, ঐ বস্তুটি সকীয় এবং নিজেই তা অমঙ্গল সৃষ্টি করে।আর তার ঐ শির্কটি ছোট বলে গন্য হবে যদি বিশ্বাস করে যে, প্রকৃত কর্তা হলেন আল্লাহ্ কিন্তু এগুলি উপকরন মাত্র। উহা এই কারণে যে, যখন কোন ব্যক্তি এমন একটি উপকরনের উপর নির্ভর করবে যাকে আল্লাহ্ উপকরন হিসাবে নির্ধারন করেননি তখন সে ব্যক্তি ছোট শির্ক কারী মুশরিক বলে গন্য হবে। আর এই শির্কের কাফ্ফারাহ্ হল হাদীসে উল্লেখিত ঐ দু'আটি {যা ইতি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে}।

ঢ) তারকার প্রভাব দ্বারা ইস্তেস্কা করা তথা (বৃষ্টি প্রার্থনা করা) বড় শির্ক। উহা দুই ভাগে বিভক্তঃ

প্রথমঃ বড় শির্ক। আর এই শির্কের দুটো পদ্ধতি আছেঃ
– ঐ নক্ষত্রগুলোর নিকট পানি তলবের দোয়া করবে যেমন বলবে: যে ওমুক তারকা! আমাদেরকে পানি দান কর। অথবা আমাদের ফরিয়াদ শ্রবন কর। (ইত্যাদি)। ইহা আল্লাহর উলুহিয়্যাতের মধ্যে বড় শির্ক। কারন ইহাতে গাইরুল্লাহ্কে আহবান করা হয়।
– বৃষ্টি বর্ষনকে এই সমস্ত তারকা রাজির দিকে সম্পর্কিত করা। এই ভিত্তিতে যে, এগুলি আল্লাহ (ছাড়াই) স্বয়ং কর্ম সম্পাদন কারী। যদি সে এবিশ্বাস করে তবে ইহা আল্লাহর মালিকানায় বড় শির্ক স্থাপন বলে গন্য, যদিও সে ঐগুলিকে আহবান না করে।

দ্বিতীয় : ছোট শির্ক।
আর তা হল এই যে, কোন ব্যক্তি এই তারকা গুলিকে পানি বর্ষন ইত্যাদির কারন সাব্যস্ত করবে এই বিশ্বাস রেখে যে (একমাত্র আল্লাহই হল সৃষ্টিকারী ও কর্মকর্তা। ইহাও এজন্য শির্ক বলে গণ্য যে,) যে ব্যক্তি এমন বস্তুকে কারন হিসাবে গণ্য করবে যাকে আল্লাহ্ "কারন" হিসাবে নির্ধারন করেনি তাহলে সে ছোট মুশরিক বলে গন্য হবে।

সুতরাং বৃষ্টিকে তারকার দিকে সম্পর্কীত করন তিন ভাগে বিভক্তঃ
প্রথমঃ আবিস্কার বা সৃষ্টিগত সম্পর্ক - আর ইহা হল বড় শির্ক।
দ্বিতীয়ঃ উপকরনের সম্পর্ক অর্থাৎ উহাকে শুধুমাত্র উপকরন হিসাবে গন্য করা। ইহা ছোট শির্ক।
তৃতীয়ঃ সময়ের দিকে সম্পর্ক করা। ইহা জায়েয আছে। যেমন কেউ বলে "এই তারকার মাধ্যমে আমরা বৃষ্টি পেয়েছি" - এই কথা দ্বারা যদি ইহা উদ্দেশ্য করে যে, আমাদের নিকট বৃষ্টি এসেছে এই তারকার সময়। {এতে কোন অসুবিধা নেই}
এজন্যই বিদ্যানগণ বলেছেন: "এই তারকার কারণে আমরা বৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছি'' এই কথা বলা হারাম। তবে এভাবে বলা বৈধ আছে যে, আমরা এই তারকার সময় বৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছি। (প্রথমটি অবৈধ ও দ্বিতীয়টি এজন্যই বৈধ) কারণ আরবী অক্ষর "الباء" বা"টি কারণ দর্শানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং "ফী" হরফটি সময় বা স্থান বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: (وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَـذِّبُوْنَ)আর তোমরা তোমাদের রিযিকের শুকরিয়া এভাবে করছ যে তোমরা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ। (আল ওয়াকেআহ্,-৮২)
ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: অত্র আয়াতে "রিযিক" দ্বারা বৃষ্টি উদ্দেশ্য আর উহাকে মিথ্যায় পরিনত করার অর্থ হল: উহাকে তারকা রাজির দিকে সম্পর্ক করা।
হযরত আবু মালিক আশআরী হতে বর্নিত, নবী (সা:) বলেন: আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলী যুগের চারটি স্বভাব বিদ্যমান থাকবে, যা তারা পরিহার করবে না। ১) বংশ মর্যাদা নিয়ে গৌরব করা, ২) বংশ নিয়ে সমালোচনা করা, ৩) তারকার মাধ্যমে পানি তলব করা, ৪) (কারো মৃত্যু হলে) জোরে জোরে চিৎকার করে ক্রন্দন করা। (মুসলিম)
নবী (সা:) পরিস্কার ভাবে বলে দিয়েছেন যে, এই সমস্ত আচরনগুলি অন্ধকার যুগের লোকদের কর্ম এবং যা লোকেরা করেই যাবে (নিষেধাজ্ঞার পরেও বিরত হবে না)। আর ঐ সমস্ত স্বভাবের অন্যতম হল তারকা রাজি দ্বারা পানি তলব করা।

সমাপ্ত